আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
১-১৫ জানুয়ারি ২০১৯ ১৬-৩০ পৌষ ১৪২৫

আরেক রকম-এর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ...

মূল্য : ২০ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী (৪নং ফর্ম) 'আরেক রকম' পাক্ষিক পত্রিকার স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

১. প্রকাশের কাল	:	পাক্ষিক
২. প্রকাশকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৩. মুদ্রকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৪. সম্পাদকের নাম	:	শুভনীল চৌধুরী
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ফ্ল্যাট-কে-১, ব্লক-৩ ৫০/এ কলেজ রোড পি.ও.-বোটানিক্যাল গার্ডেন হাওড়া ৭১১ ১০৩
৫. প্রকাশের ঠিকানা	:	৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২
৬. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সমাজচর্চা ট্রাস্ট ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২

আমি তৃষিতানন্দ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা জানুয়ারি, ২০১৯ স্বাঃ তৃষিতানন্দ রায়

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪২

১. অশোকনাথ বসু
১২৪/৯/১ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

২. তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২

৩. অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ফ্ল্যাট ১৬এফ, 'সপ্তপর্ণী'
৫৮/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৪. তৃষিতানন্দ রায়
এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯১

৫. অমিতকুমার রায়
ফ্ল্যাট ৩সি, পুষ্প অ্যাপার্টমেন্ট
৬৩এ ব্রাইট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৬. সুজিত পোদ্দার *কার্যনির্বাহী সদস্য*
এ. কে. ১২৭, সেক্টর ২, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

পাঁচ হাজার টাকা ট্রাস্ট-কে অনুদান দিলে আজীবন 'আরেক রকম'-এর প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১-১৫ জানুয়ারি ২০১৯,
১৬-৩০ পৌষ ১৪২৫
Vol. 7, Issue 1st, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদচিত্র: নন্দলাল বসু-র 'পৌষমেলা'
(সৌজন্য: স্বপনকুমার ঘোষ)
ভিতরের ছবি: সম্পর্ক মণ্ডল

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
তথ্যগত ভুলের বিচার ৫
আন্তঃদলীয় সশস্ত্র সংগ্রাম ৭

সমসাময়িক
ফ্রান্সের সংকট ৯
ওয়াটারগেট দ্বিতীয় ভাগ ১০
কাশ্মীরিদের কাছে ভূস্বর্গ কবে স্বর্গ হবে? ১২

পরিবেশ বিপন্ন: নীরব শুধু রাজনীতিকরা
মিলন দত্ত ১৪

আতশকাচে মোদী সরকার
কর্মসংস্থানের সংকট
শুভনীল চৌধুরী ১৭

ফিরে দেখা: ৬ নভেম্বর, ১৯৪৭
শেখর দাশ ২০

জেএনইউ-র ছাত্রআন্দোলন থেকে বলছি
প্রতীম ঘোষাল ২৫

ইতিহাসের বাজারদর: চাহিদা ও জোগান
সৌরদীপ চট্টোপাধ্যায় ২৮

পিপ্‌রাহ্‌ওয়ায় প্রাপ্ত একটি লেখ এবং কিছু সমস্যা
নিতাই জানা ৩৪

সাহিত্যের নবজন্ম: প্রসঙ্গ আফ্রিকা
সলিল চট্টোপাধ্যায় ৩৮

অন্য এক রেনেসাঁস
অনুরাধা রায় ৪৬

চিঠির বাক্সো ৫১

পুনঃপাঠ
কে গেলেন? গণেশ ঘোষ, স্বদেশী করত
অশোক মিত্র ৫৪
দেশপ্রেম ও সাম্যবাদের সমুজ্জ্বল সমন্বয়কারী ৫৭

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
সম্পাদক : শুভনীল চৌধুরী
প্রকাশক : তৃষিতানন্দ রায়
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২

স্বত্বাধিকারী
সমাজচর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার - ৯৪৩২২১৯৪৪৬

নিবেদন

আরেক রকম, সপ্তম বর্ষে পা রাখল। ২০১২ সালে একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা প্রকাশ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন অশোক মিত্র এবং তাঁর সতীর্থরা। তারপরে ১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ৬ বছর ধরে লাগাতার প্রত্যেক মাসের ১ ও ১৬ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে *আরেক রকম*। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, অশোক মিত্র, ১ মে ২০১৮ প্রয়াত হন। তার পরেও বহু মানুষের পরিশ্রম, সংহতি এবং শুভকামনাকে পাথেয় করে *আরেক রকম* নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমরা পত্রিকার পাঠক, লেখক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা, ছাপাখানার বন্ধু— সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমাদের পাশে থাকার জন্য।

২০১৯ সাল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই বছরে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ভবিষ্যৎ। আমরা লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি কলাম শুরু করছি, যেখানে নিয়মিত তথ্য সহকারে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত করা হবে। বিজেপি-কে হারানোর উদ্দেশ্যে এটি আমদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পাঠকদের অবগত করতে চাই যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী *আরেক রকম*-এর সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হতে রাজি হয়েছেন যার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক বাগচীর পরামর্শে *আরেক রকম* আরো সমৃদ্ধ হবে, আশা করা যায়।

সব শেষে, ষষ্ঠ বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার লগ্নে *আরেক রকম*-এ প্রকাশিত অশোক মিত্রের নিবেদন থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করলাম,

‘গোটা দেশে সম্ভবত *আরেক রকম*-ই একমাত্র প্রকাশনা যা গল্প, কবিতা, উপন্যাস উহ্য রেখেও নিয়মিত প্রতি পক্ষকালে বেরোচ্ছে।... আমাদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা আছে, কিন্তু তা বলে আমরা অন্য মতাদর্শের উল্লেখ বা আলোচনায় দাঁড়ি টানিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ধর্মান্ধতা, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী যেকোনো প্রবণতা; এ-সমস্ত ভয়ংকর মানসিকতার বিরুদ্ধে *আরেক রকম*-এর সংগ্রাম অব্যাহত থাকছে, থাকবে।’

সম্পাদক

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

তথ্যগত ভুলের বিচার

অতঃপর মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দান করলেন যে, রাফাল চুক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো দুর্নীতি হয়েছে এমন প্রাথমিক প্রমাণ নেই, তাই তা তদন্ত করে দেখার প্রয়োজনীয়তাও নেই। স্বাভাবিকভাবেই, দেশের শাসকদল বিজেপি এই রায়ে উল্লসিত হয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করছে, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলকে একহাত নিচ্ছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে কিছু গুরুতর বিষয় উঠে এসেছে, যা বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের জন্ম দিতে বাধ্য।

সুপ্রিম কোর্টের সামনে মূলত তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথমত, মামলাকারীরা আদালতে জানিয়েছিলেন যে, ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩৬টি রাফাল বিমান কেনার যে চুক্তি করেন তা সামরিক সামগ্রী ক্রয়ের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটিতে আলোচনা না করে, তাকে পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে ঘোষণা করা হয়। সরকার তার হলফনামায় এই দাবির সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরে তাতে সিলমোহর লাগানোর কাজ করে এই কমিটি, যা পরিষ্কারভাবে সামরিক সামগ্রী কেনার যে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি তার বিরোধী। কিন্তু মহামান্য বিচারপতিরা এই প্রক্রিয়াকে কোনো গুরুতর সমস্যা বলে মানতেই রাজি হননি। সামরিক সামগ্রী কেনার প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে কেন রাফাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তার কোনো সদুত্তর সরকারও দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি আর সুপ্রিম কোর্টও এই উল্লঙ্ঘনকে গুরুত্বই দেননি। বরং আইনের দায়রার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দেশের প্রতিপক্ষদের সামরিক প্রস্তুতির নিরিখে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ছিল দেশের সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানোর যুক্তি নিয়ে নয়, প্রশ্ন ছিল সেই সামরিক প্রস্তুতির অঙ্গরূপে রাফাল চুক্তি যথাযথ বিধি মেনে সই করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে। সুপ্রিম কোর্ট এক অর্থে এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল রাফাল বিমানের দাম নিয়ে। মামলাকারীরা অভিযোগ করেন যে, এপ্রিল ২০১৫-তে একটি বিমানের দাম ৭১৫ কোটি টাকা ধার্য করা হলেও, পরে রিলায়েন্স ও ডেসল্ট (রাফাল বিমান যেই কোম্পানি বানায়) জানায় যে বিমানের দাম হবে ১৬০০ কোটি টাকা। মামলাকারীরা অভিযোগ করেন যে এই বাড়তি দামের কারণ হল রিলায়েন্সের যন্ত্রসামগ্রী প্রস্তুত করার দায় ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়। সরকারের তরফে বলা হয় যে বিমানের দামের বিষয়টি গোপনীয় এবং তা প্রকাশ্যে আলোচনা করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিকভাবে দামের বিষয়ে ঢুকতে চাননি। কিন্তু পরে তাঁরা বন্ধ খামে সরকারের থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিরা রায়ে লেখেন যে কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষক (সিএজি)-কে নাকি দামের বিষয়টি জানানো হয়েছে, যা সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি পরীক্ষা করে দেখেছে, যার কিছু অংশ সংসদে পেশ করা হয়েছে। এখানেই মহামান্য বিচারপতিরা একটি গুরুতর তথ্যগত ভুল করে ফেলেন। রাফাল সংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট সিএজি বানায়নি অতএব তা সংসদীয় কোনো কমিটি বা সংসদের সামনে পেশও করা হয়নি। বন্ধ খামে সরকার যা লিখে দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট তা বিশ্বাস করে এই রায় দেন। কিন্তু এই তথ্য ভুল ছিল যার ফলে সরকারও পরে সুপ্রিম কোর্টকে এই ত্রুটির কথা জানিয়ে তাকে সংশোধন করতে বলে। বন্ধ খামের মধ্যে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরকার কেন সুপ্রিম কোর্টকে দিল? সুপ্রিম কোর্টই-বা তা যাচাই না করে বিশ্বাস করলেন কেন? এইসমস্ত গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। বন্ধ খামে পেশ করা তথ্য মামলাকারীরা জানতে পারছেন না এবং তাকে প্রশ্ন করতে পারছেন না। সরকারের পেশ করা এই তথ্যের ভিত্তিতে, শুধুমাত্র তাদের দেওয়া তথ্যকে বিশ্বাস করে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ন্যায় বিচার করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

তৃতীয়ত, মামলাকারীরা প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলান্দের বয়ানের ভিত্তিতে দাবি করেছিলেন যে অনিল আম্বানির কোম্পানিকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডেসল্ট এবং ফরাসি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। মামলাকারীরা আরো জানান যে অনিল আম্বানির কোম্পানির বিমান বানানোর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, কোম্পানিটিই তৈরি হয়েছে চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার কয়েক দিন আগে। সুপ্রিম কোর্ট এইসমস্ত বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে ফরাসি রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ভারত সরকার এবং ডেসল্ট কোম্পানি খারিজ করেছে অতএব এই বিষয় নিয়ে ন্যায়ালয়ের পর্যালোচনার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ, মামলাকারীরা তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোনো তদন্ত না করেই শুধুমাত্র সরকারের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে এই আর্জি খারিজ করে দিলেন। তাঁদের রায়ে বিচারপতিরা জানালেন যে, ২০১২ সালে ডেসল্ট কোম্পানি রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। কিন্তু আবারও বিচারপতিদের রায়ে তথ্যগত ভুল দেখা গেল। ২০১২ সালে ডেসল্ট কোম্পানি যেই রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি করেছিল তার মালিক হল মুকেশ আম্বানি আর বর্তমানে বিতর্ক চলছে অনিল আম্বানির কোম্পানিকে নিয়ে। এহেন তথ্যগত ভুল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কীভাবে থেকে গেল?

তবে তথ্যগত ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের বিষয়টি শুধুমাত্র রাফাল চুক্তির রায়ে সীমাবদ্ধ নেই। এনআরসি সংক্রান্ত মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যেই রায় দেন, তাতে তাঁরা লেখেন যে বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ যার মধ্যে ৫০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে অসমে। তথ্যসূত্র হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট ১৪ জুলাই ২০০৪-এ সংসদে উত্থাপিত একটি লিখিত প্রশ্নের সরকারি জবাবের উল্লেখ করেন। কিন্তু জুলাই ২০০৪-এ রাজ্যসভায় এই প্রশ্নের উত্তর সংশোধন করে তৎকালীন সরকার জানায় যে বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের সঠিক বাস্তবসম্মত সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। এক সমাজকর্মী তথা গবেষক ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে তথ্যের অধিকার আইনে জানতে চান যে বেআইনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ বলে যে বলা হয়েছে তার বাস্তব ভিত্তি কী? কোনো সমীক্ষার ভিত্তিতে এই সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে কি না? এর জবাবে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানায় যে যেহেতু বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা গোপনে ভারতে ঢোকে এদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়! অথচ, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি সংক্রান্ত মামলার রায়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী আছে বলে উল্লেখ করেছেন, যার ভিত্তিতে বিজেপি গোটা দেশে বিভেদ ছড়াতে ব্যস্ত, যার ভিত্তিতে অসমে বসবাসকারী বহু মানুষকে রোজ বিবিধ প্রকারের অন্যায়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দেশের সাধারণ মানুষ সুপ্রিম কোর্টকে এক সুউচ্চ আসনে বসিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে এসেছেন তা আমাদের গণতন্ত্রকে মজবুত করেছে, সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ হিসেবে তা কাজ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের মুখ থেকে বেরোনো প্রতিটি কথা, বিচারপতিদের লেখা প্রতিটি রায়ের প্রতিটি বাক্যের তাই প্রবল গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে যদি তথ্যগত ভুল থেকে যায়, যদি মনে হয় যে, সুপ্রিম কোর্ট সরকারের বক্তব্যকে বিনা প্রশ্নে মান্যতা দিচ্ছেন, তবে সাধারণ মানুষের বিচারের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের উপর যে ভরসা রয়েছে তাতে আঘাত লাগবে। রাফাল মামলায় যেভাবে বন্ধ খামের ভিত্তিতে বিচার হয়েছে, সংগৃহীত তথ্যে বিভিন্ন তথ্যগত ভুল রয়ে গেছে বা এনআরসি মামলায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা যেভাবে সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছেন তাতে প্রশ্নগুলির নিরসন হয়নি, বরং তা আরো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

আন্তঃদলীয় সশস্ত্র সংগ্রাম

ঁআইন-শৃঙ্খলার অবনতির সংজ্ঞা এখন পালটে গেছে। কারণ, আমরা সংবাদমাধ্যমে প্রতিদিন শুধুই মর্মান্তিক অত্যাচার, দাঙ্গা, হত্যা, নারী নির্যাতন, মারামারির ভয়াবহ খবর দেখে বা পড়ে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে গেছি। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রাম, শহর নগরের আনাচেকানাচে এর হিসেব রাখা মুশকিল। এসব নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। অনেকে বলবেন নতুন কিছু নয়। আগেও ছিল, এখনও চলছে, হয়তো বেশি মাত্রায়। কিন্তু প্রতিদিনই সুস্থ সবল মানুষ, নারী, শিশু, ছাত্র, যুবক, খেতমজুর, শ্রমিককে কোনো-না-কোনো কারণে প্রাণ দিতে হচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসার অভাব বা ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে। পরিবহণ নিয়ন্ত্রণের অভাবে মৃত্যু, স্কুল কলেজে হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যু, কারণ বিবিধ, পরিণাম মৃত্যু।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নকশাল বাড়ির জমির আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তারপর নকশাল আন্দোলন গোটা রাজ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে। হিংসাত্মক ঘটনায় ছাত্র, যুবক অনেকে জড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন এই আন্দোলন দমন করার নামে ব্যাপক হিংসাত্মক আক্রমণ চালায়। ফলে শয়ে শয়ে ছাত্র যুবক গুলিতে বা সংঘর্ষে প্রাণ হারায়। এই সংঘর্ষ বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্র বা যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রামে-গঞ্জে শহরে পাড়ায় পাড়ায় সর্বত্র উদ্‌বেগ ছড়িয়ে পড়ে। যেকোনো সময় যেকোনো অঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

বর্তমানে যেভাবে পরিস্থিতি এগোচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে ত্রাস-এর অবস্থা সর্বত্র কায়েম হলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। বিগত কিছুদিনের ঘটনায় ভয় হয় আমরা কি সে দিকেই এগোচ্ছি? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ এখন অনেক কমের দিকে। কারণ, বর্তমান শাসকদল রাজ্যে ক্ষমতায় এসে একদলীয় শাসন কায়েম করার লক্ষে এগোতে থাকে। প্রথমেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, বিরোধী দলের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সন্ত্রাসের অবস্থা তৈরি করা হয়। বহু মানুষের প্রাণ যায়। তারপরও যে ক-জন বিরোধী দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়, তাদেরকেও হয় ভয় দেখিয়ে নয়তো দল ভাঙিয়ে অথবা প্রাণে মেরে বিরোধীশূন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়।

কিন্তু এখন যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রতিদিন হচ্ছে তা মূলত তৃণমূলের আন্তঃদলীয় সশস্ত্র সংগ্রাম। শাসকদলের এক নেতার দলবল অপর গোষ্ঠীর নেতার অনুগামীদের ওপর লাঠি, বোমা, পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সুন্দরবন থেকে কোচবিহার, পুরুলিয়া, মালদহ, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা— সব জায়গায় একই চিত্র। অন্তর্কলহে নিহতদের প্রায় সকলেই বয়সে যুবক। গত ১৩ ডিসেম্বর, জয়নগরের ঘটনা রাজ্যের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিচলিত করেছে। ওইদিন রাত আটটায় একদল সশস্ত্র লোক, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের গাড়ি, এলাকার দলের কার্যালয়ের সামনে দাঁড়ালে তৎক্ষণাৎ গাড়ি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। ওদের বোমা,

গুলিতে গাড়ির চালক, বিধায়কের সহকারী দলীয় নেতা এবং জনৈক বিধায়কের সাক্ষাৎপ্রার্থী স্থানীয় যুবক আমিন আলি প্রাণ হারায়। বিধায়ক ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে গেছেন। তাই প্রাণে বেঁচে গেছেন। তবে তিনি সংবাদমাধ্যমকে ওইদিনই জানিয়ে দিয়েছেন আক্রমণের লক্ষ্য তিনিই ছিলেন। বিধায়কের কথায় ধরে নেওয়া যায় আক্রমণের কারণও ওঁর জানা এবং হয়তো আক্রমণকারীদেরও তিনি চিনবেন। যেকোনো মৃত্যুই মর্মান্তিক। কিন্তু যে নিরীহ যুবক বিধায়কের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ওদের দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকেও প্রাণ দিতে হল। পরদিন মৃত আমিন আলির বোন, সংবাদমাধ্যমের লোকজন দেখা করতে গেলে জানায়, ওর দাদা ওর জন্যই কোনো কারণে বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অকালে প্রাণ দিয়েছে। ওই মেয়ে কি কোনোদিন দাদার মৃত্যুর শোক ভুলতে পারবে!

প্রতিদিন আন্তঃপার্টি সংঘর্ষের বিবরণ পড়লে দেখা যাবে জয়নগরে নিহত আমিন আলির মতো নিরীহ মানুষও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কোনো-না-কোনো কারণে প্রাণ হারাচ্ছেন। অনেক নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে, যেমন গণতন্ত্র বাঁচাও, মুক্তমঞ্চ আবার আরো অনেক সংগঠন আছে যারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, কৃষকের জমি রক্ষার জন্য এইরকম বিবিধ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে যুক্ত। ওঁরা যদি ওদের কর্মসূচিতে এই বিষয়গুলিও ভেবে দেখেন, তাহলে মানুষের চেতনায় ভরসা দিতে পারবে।

আগামী দিনে এইরকম দলীয় সংঘর্ষ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করার কারণ অনুমান করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এই লড়াই অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই বিবাদ, অধিকার রক্ষার বা অধিকার অর্জন করার দ্বন্দ্ব। অধিকার পাওয়ার অর্থ প্রচুর অর্থের ওপর অধিকার পাওয়া। এই দ্বন্দ্বে যারা শক্তিশালী হবে, ওরা পারবে আগামী দিনে তৃণমূলের প্রত্যাশা পূরণ করতে। দল চায় বিরোধীশূন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা, লোকসভা সবই থাকবে। থাকবে না শুধু বিরোধী দলের উপস্থিতি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায় থানা-পুলিশের উপর। আজকাল যেকোনো পদাধিকারীই হোন, পুলিশ শাসকদলের যে অংশ ক্ষমতায় থাকবে, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো কাজ করবে না। বিগত কয়েক বছরে এটাই আমরা দেখে আসছি। কোনো নারীর শ্লীলতাহানির কাণ্ডে যদি শাসকদলের লোক জড়িত থাকার অভিযোগ করতে যাওয়া হয়, থানা থেকে বলা হয়, নিজেরা মিটিয়ে নিন। তাই এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা এখন ক্রমবর্ধমান।

শাসকদলের পক্ষে এই পরিস্থিতির উপর লাগাম টানার কোনো সদিচ্ছা থাকবে না, ওরা মুখে যাই বলুক। এদের হাত ধরেই আগামী দিনে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হবে ক্ষমতাসীনদের।

আশু বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, দরকার জনমত তৈরি করা। তবেই আমিন আলির মতো আরো অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচানো যাবে।

সমসাময়িক

ফ্রান্সের সংকট

পুঁজিবাদ এমনই এক শক্তি যা দেশকালের সীমানা ভেঙে দেয়। আদর্শ, বন্ধুত্ব, শত্রুতা জাতীয় সহজাত মানবিক সম্পর্কগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের ওপরে স্থাপিত করে একমাত্র সত্য, টাকার স্বার্থ। প্রায় দেড়-শো বছর আগে কার্ল মার্কস এরকম মন্তব্যই করেছিলেন তাঁর দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থে। দেড়-শো বছরে পৃথিবীর বুক দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেলেও কিছু কিছু সত্য যে পালটায় না, সেটা বোঝা যায় আজকের ফ্রান্সের দিকে তাকালে সরকারবিরোধী 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন যখন তুঙ্গে, যখন আন্দোলনের দাবিদাওয়া তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদের সংকটও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাকরঁ সাহায্য প্রার্থনা করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকজির। দক্ষিণপন্থী সারকজি তাঁর একদা রাজনৈতিক শত্রু এবং বাম ঘেঁষা সমাজ-গণতন্ত্রী ম্যাকরঁ-র সমর্থনে এগিয়ে এলেন। সংকটাপন্ন পুঁজিবাদকে বাঁচাবার স্বার্থ মিলিয়ে দিল রাজনীতির আপাতবিরোধী অবস্থানে থাকা বিভিন্ন মেরুদের। একেই হয়তো অভিহিত করা যেতে পারে আলথুস্যের বর্ণিত পুঁজির অন্তর্নিহিত বিধুর মোহিনী সৌন্দর্য হিসেবে, যার আকর্ষণ এতই তীব্র যে মানবিক আদর্শ এবং প্রবৃত্তিগুলির পিছুটানকেও এর দ্বারা ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়।

জ্বালানির কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ফ্রান্সে ১৭ নভেম্বর থেকে চলছে 'ইয়েলো ভেস্টস' আন্দোলন, যা ফ্রান্সের ইতিহাসে গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে বৃহত্তম। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু দোকানপাট, অফিস, ট্রেন ও বাস স্টেশন। কয়েক লাখ মানুষ ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে এসেছেন। প্যারিস থেকে শুরু করে দেশের একটা বড়ো অংশ ফুটছে। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে এরই মধ্যে চার জনের প্রাণ গিয়েছে, আহত প্রায় সাতাশ। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, জ্বালানি কর বৃদ্ধির কারণে চলতি শতাব্দীর গোড়া থেকেই তাঁরা ভুগছেন। মাকরঁ-র আমলে আরো বিগড়ে গিয়েছে পরিস্থিতি। তাঁদের অভিযোগ, সমাজের নীচু তলার প্রতি কোনো নজর নেই প্রেসিডেন্টের। তাই স্লোগান উঠছে— 'মাকরঁ দূর হটো'। প্রথম শনিবার শুধু রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু লোহার রড, কুড়ুল নিয়ে আসা প্রতিবাদীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। যা সামাল দিতে পুলিশও যথেচ্ছ লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ।

ঘটনা হল, বিক্ষোভের চাপে প্রেসিডেন্ট এমান্যুয়েল ম্যাকরঁ আগেই জানিয়েছেন, জ্বালানি তেলের দাম আপাতত আর বাড়ানো হবে না। আগামী জানুয়ারি থেকে জ্বালানির উপর যে পরিবেশবান্ধব কর বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেটিও প্রত্যাহার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভের আশঙ্কা কেন? কারণ আন্দোলন আর জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিষয়টি এখন শহুরে বিত্তবান বনাম গ্রামীণ বঞ্চিতের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রায় নব্বই শতাংশই গ্রামের বাসিন্দা। অনেকে আবার মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলাতে না পেরে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছেন। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের ক্ষোভে ঘি ঢেলেছে! বিক্ষোভকারীদের ভিড় থেকে স্লোগান উঠেছে, 'ধনীদের সরকার ম্যাকরঁ সরকার।' আন্দোলনে জুড়েছে নয়া দাবিও। ন্যূনতম পেনশন, কর কাঠামোর আমূল সংস্কার, অবসরের বয়স-সীমা হ্রাসসহ ৪০টিরও বেশি দাবি রয়েছে এই তালিকায়। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে এই বিক্ষোভ এখন ম্যাকরঁ-স্কয়ারের বিরোধী দেশব্যাপী আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে। একেই বোধহয় ইতিহাসের পুনরাবর্তন বলে। ১৯৬৮ সালে প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিশ্রুত ছাত্র-আন্দোলনের মূল দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রাবাসে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে রাত্রিবাস করবার অধিকার। বাড়তে বাড়তে সেই আন্দোলন কালক্রমে এমন জায়গায় গিয়েছিল যার মধ্যে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, লিঙ্গ সাম্য, কর্মের অধিকার ইত্যাদি। সেই আন্দোলনের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে দেশ ছাড়তে হয়েছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি দ্য গলকে। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে ফ্রান্স নিজেকে যেন পুনরাবিষ্কার করছে প্যারিসের রাজপথে পুলিশের সঙ্গে স্ট্রিট-ফাইট আর ব্যারিকেড বাঁচাবার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে।

কেন এই আন্দোলনকে পুঁজিবাদের সংকটের ফলাফল

হিসেবে দেখা হচ্ছে? আন্দোলনকারীদের বক্তব্য হল, বর্তমান সরকার খরচ কমানোর নামে সামাজিক সুরক্ষাগুলির ওপর কোপ নামিয়ে আনছে, এবং করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে গরীব মানুষের কাঁধে। কিন্তু ধনী অভিজাতদের উপর কর একফোঁটাও বাড়ানো হয়নি। আর এটা করা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন নিয়মের জন্য— রাজস্ব ঘাটতি তিন শতাংশের বেশি রাখা যাবে না। এই মাত্রার মধ্যে রাজস্ব ঘাটতিকে বাঁধতে গেলে হয় উচ্চবিত্ত শ্রেণির উপর কর বাড়াতে হবে আর নাহলে সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবাগুলিকে কাটছাঁট করতে হবে। ম্যাকরঁ সরকার তাদের শ্রেণি অবস্থান অনুযায়ী দ্বিতীয় রাস্তাটিই বেছে নিয়েছে। বস্তুত, ম্যাকরঁ দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে ধনবান ব্যক্তিদের উপর করের পরিমাণ তিনি বাড়াবেন না, এবং এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনমনীয়। বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে এই সরকারের শ্রেণি-আনুগত্য কাদের প্রতি। সেই আনুগত্যের সূত্র ধরেই বর্তমান সারকোজি-ম্যাকরঁ জোটের পেছনের রাজনীতিকে দেখতে হবে।

ম্যাকরঁ ইতিমধ্যেই গণমাধ্যমে এসে ঘোষণা করেছেন যে তিনি আন্দোলনকারীদের কিছু দাবি মেনে নিচ্ছেন। ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি, পেনশন কাঠামোর বিস্তৃতি ইত্যাদি দাবিগুলি হল তাদের মধ্যে অন্যতম। সমস্যা হল, এর ফলে রাজস্ব ঘাটতি তিন শতাংশের বেশি বেড়ে যাবে। এটাকে সামাল দেওয়া যেতে পারে একমাত্র ধনী শ্রেণির উপর করের পরিমাণ বাড়িয়ে, যেটা তিনি করবেন না। কর কাঠামোর সংস্কার না করলে কোষাগারে টাকা আসবে না, আবার আন্দোলনকারীদের দাবি মানলে সরকারের ঘর থেকে বেশি করে টাকা বেরোবে। ফলত, রাজস্ব ঘাটতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেঁধে দেওয়া সীমা ছাড়িয়ে যাবে। এর ফলে যেটা ঘটবে, ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক বাজারে ধার করতে হবে। সেই ধার যেহেতু করতে হবে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কাছ থেকে, তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া পূরণে ম্যাকরঁ বাধ্য হবেন। আর লগ্নি পুঁজির স্বার্থে কাজ করবার অর্থই হল খেটে-খাওয়া মানুষের উপর শোষণের মাত্রা কোনো-না-কোনোভাবে বাড়িয়ে দেওয়া। এটাই ম্যাকরঁ-র সংকট, যাকে ইংরেজিতে ক্যাচ-২২ বলা হয়ে থাকে। ম্যাকরঁ যতই আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া মানবেন, ততই অন্যদিক থেকে অন্য কোনোভাবে শোষণের মাত্রা তীব্র হবে। আরো একটা উপায় অবশ্য ছিল। আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ চাপালে দেশের মধ্যে বর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করতে গিয়ে উৎপাদন বাড়ত, কমত বেকারিও। রাজস্ব ঘাটতি এতে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনে এটা করা নিষিদ্ধ, কারণ মুক্ত বাজারের অর্থনীতি তাতে ধাক্কা খেতে পারে। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে ম্যাকরঁকে তাই আপাতত কিছু রিলিফ দিতে হচ্ছে, যেগুলো আসলে ধোঁকার টাঁটি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এই রিলিফের জন্যই পরবর্তীকালে আরো বেশি করে ব্যয়সংকোচের রাস্তায় হাঁটবে সরকার। অর্থাৎ, মুক্ত অর্থনীতির স্বার্থেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বলি দিতে হবে। যদিও এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ পুঁজিবাদের ইতিহাস মানে এটাই।

ওয়াটারগেট দ্বিতীয় ভাগ

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের গন্ধ পেয়েই কি মোদী সরকার দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল? নাহলে হঠাৎ করে ল্যাপটপ ও কম্পিউটারে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র নজরদারি করবার ঘোষণা কেন করতে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার? এতখানি অস্তিত্বের সংকট কীসের জন্য? আর ২০১৮-র শেষে এসে ভারতবর্ষই-বা কী এমন বহিঃশত্রুর থেকে বিপদের আশঙ্কার সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল যে দেশদ্রোহী ধরবার জন্য সাধারণ মানুষের কম্পিউটারে এরকমভাবে নজরদারি চালাতে হবে? পাপী মন কিন্তু বলছে অন্য কথা। আসন্ন নির্বাচনের আগে এসবই করা হচ্ছে বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক আলোচনার উপর নজরদারি চালাবার উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটে পর্যুদস্ত হয়ে বিজেপি-র এমনই অবস্থা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মুখোশটুকুও তারা আর রাখতে রাজি নয়। ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি ভারতবাসী শুনছেন কি না জানা নেই, তবে ২০১৯ সালে যদি আবার ক্ষমতায় আসে, দেশের সংবিধানকে গভীরভাবে বিপন্ন করে তুলবে বিজেপি, এটা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

২১ ডিসেম্বর জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে মোদী সরকার জানিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯ ধারায় বলা হয়েছে, দশটি তদন্তকারী সংস্থা প্রয়োজনে যেকোনো কম্পিউটারে আড়ি পাততে বা নজরদারি করতে পারবে। যেকোনো কম্পিউটারে থাকা সব তথ্য ডিক্রিপ্ট বা পাঠোদ্ধারের অধিকার থাকবে সংস্থাগুলির কাছে। বিজ্ঞপ্তিতে আলাদা করে মোবাইলের কথা বলা না হলেও, মন্ত্রক জানিয়েছে— স্মার্টফোনগুলি কার্যত কম্পিউটার হওয়ায় নজরদারির আওতায় থাকবে সেগুলিও। কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি যদি দশটি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কম্পিউটারের তথ্য সরবরাহে অসহযোগিতা করে তবে তার সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

নজরদারির এই ইস্যুটি নতুন নয়। নব্বইয়ের দশক থেকেই সুপ্রিম কোর্টে নজরদারি বনাম ব্যক্তিমানুষের জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে বিভিন্ন মামলা হয়েছে। ছবিটা বদলিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণ এবং সেই সূত্রে ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবার পর। ২০০৯ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকার আইটি অ্যাক্টের মধ্যে সাইবার-নিরাপত্তার বিষয়টিও যোগ করে। স্বাভাবিকভাবেই সামনে চলে আসে নজরদারির ইস্যু। কারা নজরদারি করতে পারে? ২০০৯ সালের আইন অনুযায়ী, এই ক্ষমতা রাজ্য পুলিশ এবং আটটি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ছিল। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং-এর হাতেও এই অধিকার তুলে দেওয়া হয়। আজ যখন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তার কিছুটা দায় আগের সরকারগুলির ওপরেও বর্তায় বই-কী। অরুণ জেটলি বলেছেন যে একশো বছর আগের ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাক্টকেই বিস্তৃত করা হয়েছে। মানে দেশদ্রোহী বা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কাজের সন্দেহেই নজরদারি চালানো যাবে। যেমন পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার এই টেলিগ্রাফিক অ্যাক্ট দিয়ে টেলিগ্রাফে নজরদারি চালাত। কারোর উপরে নজরদারি করার প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রসচিব বা নিদেনপক্ষে যুগ্মসচিব বা আইজি পর্যায়ের অফিসারের অনুমতি লাগত। কিন্তু জারি হওয়া নতুন বিজ্ঞপ্তিতে এ নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। ফলত, এর সুযোগে সন্দেহ হলেই যেকোনো ব্যক্তির মোবাইল বা কম্পিউটারে নজরদারি করতে পারবে সরকার। তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে জানা গেছে যে ভারতে প্রত্যেক বছর ১ লক্ষ ফোনে সরকারিভাবে আড়ি পাতা হয়। এই আড়ি পাতাকে অনুমতি দিতে হলে গড়ে ৩০০-র বেশি অনুমতিপত্রে একজন আধিকারিককে (স্বরাষ্ট্র সচিব) সই করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে প্রত্যেকটি আবেদনপত্র খুঁটিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিছুদিন আগেই আধার কার্ড নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল ব্যক্তিপরিসরের অধিকার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একজন মানুষ কী খাবেন বা কার সঙ্গে মেলামেশা করবেন তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। ইন্টারনেট-স্মার্টফোন, ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য আদান-প্রদান সরকারি নজরদারির আওতায় আসার অর্থই হল সেই ব্যক্তিপরিসরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। মূলত অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার কারণে যে-আইন আনা হয়েছিল, তা-ই এখন সরাসরি ব্যবহার করা হবে জনগণের নজরদারির কাজে। যা এতদিন হত আড়ালে, তাকেই এখন সরকারি রূপ দিল মোদী সরকার। ফেসবুক-টুইটারে রসিকতা করার অপরাধে জেলে পোরার আইন তৈরি হয়েছিল ইউপিএ জমানায়। কিন্তু নাগরিক অধিকার রক্ষায় এগিয়ে এসে সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬-এ ধারা বাতিল করে দেয়। রায়ে বলা হয়, এতে নাগরিকের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হচ্ছে। তার পরেও মোদী সরকার ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। যা বাক্‌স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তিপরিসরে সরাসরি হস্তক্ষেপ। আগের আইনে কারুর উপরে নজরদারি চালাতে গেলে নির্দিষ্ট কারণ দেখাতে হত। কিন্তু এখন সেসব এড়িয়ে 'ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার' জারি করা হয়েছে। তা ছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯-এ ধারায় কোথাও বলা নেই যে, দশটি এজেন্সির হাতে ওই দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। এগুলো সবই হল বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সরকারের সাবধানবাণী, যা প্রকৃতিতে অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী।

মুশকিলটা হল, জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক কাজ কোনটা তার কোনো রুলবুক নেই। আইবি-র মনে হতেই পারে আপনি ফেসবুকে রোজ নরেন্দ্র মোদীকে সমালোচনা করেন, এটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কাজ। অতীতেও বার বার দেখা গিয়েছে সরকার কীভাবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আইবি এবং র-এর বিতর্কিত সম্পর্ক নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। এই আইনের এরকম কিছু পরিণতিই যে হবে সেটা মোটামুটি নিশ্চিত, কারণ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে আছে এমন একটি মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী দল যারা সংবিধানের প্রতি ন্যূনতম সম্মান রাখে না।

আমেরিকাতে ১৯৭২ সালে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দল ও প্রশাসনের কয়েক জন ব্যক্তি ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটার গেট ভবনস্থ বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের সদর দফতরে আড়িপাতার যন্ত্র বসায়। ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি আজ অবধি পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর নজরদারি চালাবার একটি মাইলফলক ঘটনা হিসেবে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সম্ভবত ওয়াটারগেটের দ্বিতীয় অধ্যায় লিখবেন বলে মনস্থির করেছেন। তাঁর পক্ষে সুবিধে হল, যেকোনো প্রকারের বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দেশদ্রোহী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে পাকিস্তানে চলে যাবার পরামর্শ প্রদান করবার জন্য তাঁর আইটি সেল সদাপ্রস্তুত। প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহকে কুৎসিত গালাগালি, ট্রোলিং এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে কারণ তিনি এই সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। কম্পিউটারে নজরদারির ইস্যুতেও দেখা যাচ্ছে আইটি সেল কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে। যারা এই আইনের বিরোধিতা করছে সকলেই নাকি দেশদ্রোহী! আশা করা যায়, ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে বিজেপি-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার প্রধান বাধা এইসব দেশদ্রোহীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করা হবে, আর সেই উদ্দেশ্যে নজরদারিও জারি থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা!

কাশ্মীরিদের কাছে ভূস্বর্গ কবে স্বর্গ হবে?

কোচ মারাদোনার নেতৃত্বে মেসি, ২০১০-এ দেখা করতে গিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা নেত্রীর সঙ্গে যিনি আর্জেন্টিনার সেই আন্দোলনের নেত্রী— যার শিরোনাম— ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার)-কে ফিরিয়ে দাও, এঁরা সেনাবাহিনীর অত্যাচারে নিখোঁজ।

ভারতের কাশ্মীরেও বিধবার সংখ্যা প্রচুর। বহু মহিলা আছেন— যাঁরা জানেন না, তাঁদের স্বামীরা জীবিত না মৃত। এদের কোনো ক্ষতিপূরণ মেলে না। উলটে চলে অত্যাচার জোরজুলুম। তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। শারীরিক চাহিদা মেটাতে। না গেলেই বাড়ির সন্তানকে জঙ্গি বলে মেরে দেওয়ার হুমকি।

কাশ্মীর এক অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্র।

যুদ্ধক্ষেত্র— যেখানে সবার আগে নিহত হয় সত্য। কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় সত্য আছে। অন্য কোনো সত্য পৌঁছোয় না— বিশ্বের দরবারে। সবাই জানেন, কাশ্মীর মানে, বাড়তি সুবিধা— ৩৭০ ধারা। কাশ্মীরবাসী জানে— কার্যত কিছু নেই। সস্তার চাল নেই— সাংবিধানিক স্বাতন্ত্র্য নেই— প্রতিশ্রুতি মতো প্রধানমন্ত্রী পদ নেই— রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মোতাবেক, ১৯৪৮ সালে দেওয়া, গণভোট হয়নি— হবে বলে মনেও হয় না। তাঁরা তিন দেশের দখলে— এক, ভারত; দুই, পাকিস্তান; তিন, চিন।

ভারতের অংশের নাম জম্মু-কাশ্মীর (লাদাখ)। পাকিস্তানের নাম— আজাদ কাশ্মীর— গিলগিট-বালিস্তান। চিনের দখলে থাকা অংশের নাম— আকসাই চিন।

ভারতের অংশে রয়েছে মধ্য এবং দক্ষিণ ভাগ এবং লাদাখ। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর-পশ্চিম এলাকা। চিন উত্তর পূর্বাংশ।

ভারতে আছে কাশ্মীরের ২২২৩৩৬ বর্গ কিমি, পাকিস্তানের অংশে ৭৮১১৪ বর্গ কিমি, চিনের নিয়ন্ত্রণে ৩৭৫৫৫ বর্গকিমি।

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখের জনসংখ্যা— ১,২৫,৪১,৩০২ (২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী) জম্মুর অধিবাসী ৫৩,৭৮,৫৩৮। লাদাখের ২,৭৪,২৮৯। পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীরের সংখ্যা ৪০,৪৫,৩৬৬ (২০১৭ জনগণনা)। আকসাই চিনের জনসংখ্যা—

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যার ৭২.৪১% ছিল মুসলিম। ২০১১-য় তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৮.৩১%।

১৯৪৭-এ যুদ্ধের পর পাকিস্তান অংশ থেকে ২,২৬,০০০ জন ভারতে আসেন উদ্‌বাস্তু হয়ে। ভারতে থেকে যান ৫ লক্ষ ২৫০০০ জন। অভ্যন্তরীণভাবে ভারতে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৫০০০০-১,৫০,০০০ জন মুসলিম এবং ১,৫০,০০০-৩,০০,০০০ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত।

যখন দু-দেশে অভ্যন্তরীণ সমস্যা ঘোরতর হয়, শাসকশ্রেণি সংকটে পড়ে, তখনই ভারত ও পাকিস্তান রক্ত ঝরায় কাশ্মীরে। আজাদ কাশ্মীরেও পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারে কাশ্মীরি যুবক মারা যান, যেমন যান ভারতীয় কাশ্মীরিও। তাঁদের কোনো স্বাধীনতা নেই। আজাদ কাশ্মীরে নিহত যুবক গণ্য হন ভারতীয় চর হিসেবে। এখানে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি। আকসাই চিন— জানা যায় না তেমন— কী ঘটছে।

পুলওয়ামা— কাশ্মীরের ২২টি জেলার একটি জেলা। সেই জেলার একটি শান্ত গ্রাম সিরনু। সেই গ্রামে আপেল বাগানে ঢুকে ভারতীয় সেনাবাহিনী গুলি করে মারে সাত জন অসামরিক সাধারণ মানুষকে। একজন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সদস্য। যিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করেছিলেন— তাঁকে জঙ্গি হিসেবে মেরে ফেলা হয়। নাম জহুর আহমদ ঠোকর। মারা গেছেন এক কিশোর যে খেলছিল। গুলির আওয়াজ শুনে ভয়ে ঢুকে পড়ে আপেল বাগানে। সেখানেই ঢুকে তাঁকে সমেত গুলি করে মারা হয়েছে আরো সাত জন নিরীহ মানুষকে, ২০১৬-র আগে কাশ্মীর শান্তই ছিল। কাশ্মীরে দারিদ্র্য ছিল, অবিচার, অন্যায়, বৈষম্য, ছিল। কিন্তু কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলন বন্ধ ছিল। পর্যটকরা ফিরছিলেন। অর্থনীতিতে সামান্যগতি আসছিল। ভারতে যখন অর্থব্যবস্থা বেসামাল— মোদী তার একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করতে পারেননি ক্ষমতায় আসার দু-বছর পরে। এই অবস্থায় মোদীর প্রয়োজন ছিল একটি ইস্যুর।

হিজবুল মুজাহিদিন সদস্য বুরহান ওয়ানিকে ৮ জুলাই, ২০১৬ গুলি করে মারে ভারতীয় সেনা। বুরহান ওয়ানির ফেসবুকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। বুরহান ওয়ানির হত্যা অশান্ত করে কাশ্মীরকে। মোদী সরকার এটাই চাইছিল। লাখ লাখ জনতা পথে নামে বুরহান ওয়ানির শেষকৃত্যে। ২২ বছর বয়সী এই যুবক এখন কাশ্মীরের লোকনায়ক, তাঁকে নিয়ে অজস্র গান কবিতা রচিত হয়েছে কাশ্মীরে। তাঁকে নিয়ে বিক্ষোভে গুলি করে মারা হয় পরবর্তী ছয় মাসে ৯৬ জনকে। ৫৩ জায়গায় জারি করতে হয় কার্ফু।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির মতে, ১৯৮৯ থেকে এ পর্যন্ত এক লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন সেনাবাহিনীর হাতে। ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৮৪-র ভুলের মাশুল দিচ্ছে দেশ। ইন্দিরার পথেই চলেছেন মোদী। অজস্র ভুয়ো সংঘর্ষের নামে মেরে ফেলা হচ্ছে। বন্দি করে এনে তীব্র অত্যাচার চালানো হচ্ছে মিথ্যা স্বীকারোক্তির জন্য।

আরো বেশি অত্যাচার কাশ্মীরের মানুষের উপরে নামিয়ে না এনে সরকারের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে কেন বুরহান

ওয়ানির মতো একজন হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডারের মৃত্যু এত মানুষকে পথে নামাল? কেন কাশ্মীরের স্কুলপড়ুয়ারাও সেনবাহিনীর দিকে পাথর ছুঁড়তে ভয় পায় না।

ভুলে যাওয়া হচ্ছে, কাশ্মীরের জনসংখ্যার সাত জন পিছু একজন ভারতীয় সেনা মোতায়েন। এত সৈন্য প্রহরায় বাইরে থেকে অস্ত্র আনা অসম্ভব। পাথর ছোড়ে কেন মানুষ? গুলি না ছুড়ে পাথর ছোড়ে প্রতিবাদ জানাতে।

দিল্লি তামিলনাড়ুতে বলে পুলিশের গাড়িতে আগুন দিলে কিছু হয় না— কাশ্মীরে পাথর ছুড়লে পেলেট গান, গুলি।

দেড়মাসের শিশুও নাকি পাথর ছোড়ে!

পাথুরে নিদ্রায় শয়ান রাষ্ট্রশাসক কবে বুঝবেন— এ মিথ্যা অসারত্ব?

কবে বন্ধ হবে পুলওয়ামার মতো মিথ্যে সংঘর্ষের নামে মানুষ হত্যা।

প্রসঙ্গত ১৫ জন মানুষকে জঙ্গি বলে মেরে ফেলায় খবর করেছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া।

দোষী সরকারি সান্ত্রীরা প্রথমে রাষ্ট্রীয় পদক পায়। পরে আদালতের রায়ে শাস্তি।

আজ কোন সাংবাদিক লিখবেন— শাস্তির কথা?

এবং কবে?

এবং ভুয়ো সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা কবে শূন্য হবে?

কাশ্মীর হবে প্রকৃতি শুধু নয়, মনেরও ভূস্বর্গ। শুধু পর্যটকের নয়— কাশ্মীরীদেরও।

পরিবেশ বিপন্ন: নীরব শুধু রাজনীতিকরা

মিলন দত্ত

ফি বছর শীত পড়তে না পড়তেই লাগামছাড়া মাত্রায় পৌঁছোয় বায়ুদূষণ। শুরু হয় দিল্লি দিয়ে। অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই রাজধানী শহর ঢেকে যায় ধোঁয়ায়। পাঞ্জাব হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশজুড়ে গম আর ধান তোলা শেষ হলে তার নাড়াগুলো মাঠেই জ্বালিয়ে দেন চাষিরা। তাতে বিপুল পরিমাণ নাড়ার বোঝা যেমন ঘাড় থেকে নামে তেমনই নাড়া পোড়ানো ছাই মাঠে সারের কাজ করে। উত্তুরে হাওয়ায় সেই ধোঁয়া দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে রাজধানীর ইতিমধ্যেই দূষিত নগরের বাতাসে যোগ করে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণা। যানদূষণে নাস্তানাবুদ রাজধানীর বাতাসের দূষণ হয়ে ওঠে মারাত্মক।

কলকাতা এবছর বায়ুদূষণে দিল্লিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। কলকাতা এবছর দেশের মধ্যে দূষণে এক নম্বর। বাতাসে দূষণের সহনমাত্রার যাবতীয় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে কলকাতায়। চলতি বছরে ডিসেম্বর মাসের ৫, ৭ এবং ৯ তারিখে বাতাসে দূষণের মাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে যথাক্রমে ৪১৫, ৪২১ এবং ৪২৫ মাইক্রোগ্রাম। বাতাসের গুণমানের প্রধান নির্ধারক ভাসমান সূক্ষ্মকণা (পিএম-১০) এবং অতি সূক্ষ্মকণার (পিএম ২.৫) মাত্রা। পিএম ১০-এর ক্ষেত্রে সহনসীমা প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম আর পিএম ২.৫-এর বেলায় ৬০ মাইক্রোগ্রাম। 'পিএম' হল পার্টিকুলেট ম্যাটার অর্থাৎ বস্তুকণা। যে বস্তুকণা ২.৫ মাইক্রোমিটার বা তার কম ব্যাসের সেটা অতি সূক্ষ্মকণা। মানুষের চুলের মাপ প্রায় ১০০ মাইক্রোমিটার। অর্থাৎ একটি চুলের প্রস্থের মধ্যে এঁটে যেতে পারে ৪০টি পিএম ২.৫ বস্তুকণা বা ধূলিকণা। অতি সূক্ষ্ম এই ধূলিকণা অপেক্ষাকৃত ভারী ধূলিকণার থেকে বাতাসে ভেসে থাকে অনেক বেশি সময়। এবং শরীরে ঢুকে তা রক্তে মিশে যেতে পারে সহজে। বছর দশেক আগেও বায়ুদূষণের মাত্রা মাপা হত পিএম ১০-এর ভিত্তিতে। বাতাসে পিএম ২.৫-এর উপস্থিতি পরিমাপ শুরু হওয়ার পর থেকে বায়ুদূষণের ভয়াবহতা মানুষের সামনে আরো প্রকট হয়েছে। অথচ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। যে নেতা বা নেত্রীরা বিশ্বের সমস্ত বিষয়ে মতামত দিতে অভ্যস্ত তাঁরাও এই একটি বিষয়ে আশ্চর্য নীরব। যেন তাঁদের কোনো দায় নেই দূষণে।

বায়ুদূষণ হল বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা এবং বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বায়ুদূষণ বাড়লে যে শ্বাসজনিত রোগ এবং ফুসফুসের দুরারোগ্য ব্যাধি বাড়তে পারে, বহুদিন ধরেই তা বলা হচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বহু গবেষণা থেকে জানা গেছে, শুধু ফুসফুস বা শ্বাসনালী নয়, বায়ুদূষণ শরীরের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরেই প্রভাব ফেলে। তার ফলে ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, এমনকী অবসাদও দেখা দিতে পারে। বায়ুর বিষাক্ত উপাদান ফুসফুস থেকে সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপরেও তার প্রভাব পড়ে। শুধু ফুসফুস নয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্যানসারের জন্য বায়ুদূষণ অনেকাংশে দায়ী। একই কথা প্রযোজ্য হৃদরোগের ক্ষেত্রেও। বায়ুদূষণের মাত্রা যদি ঘনমিটার পিছু ১০ মাইক্রোগ্রাম কমানো যায়, তাহলে শ্বাসরোগ, হৃদ্‌রোগের মাত্রা তিন শতাংশ কমতে পারে।

এত কিছুর পরেও এ রাজ্যে কিন্তু দূষণের প্রকোপ নিয়ে প্রশাসনের প্রায় কোনো মাথাব্যথা নেই। বায়ুদূষণ মহানগরবাসীর স্বাস্থ্যে কতটা প্রভাব ফেলছে তা পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা মেনে নেওয়ার পরেও এ নিয়ে কোনো সমীক্ষা তাঁরা করেননি। বছর কয়েক আগে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে একবার এই ধরনের সমীক্ষা করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু তার কোনো গাইডলাইন মেলেনি। ফলে সেই কাজও আর এগোয়নি।

মারাত্মক দূষণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি যে অবশ্যম্ভাবী, তা মেনে নিয়েছেন পরিবেশকর্তারা। তাহলে এর হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো উপায় আছে কী?

তা নিয়ে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তাদের কোনো তাড়া নেই। তাঁরা বলছেন, কোন কোন উৎস থেকে শহরে কতটা দূষণ ছড়াচ্ছে, সেটা আগে খুঁজে বার করা প্রয়োজন। তবে

অতীতে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে কলকাতায় দূষণের প্রধান উৎস গাড়ির ধোঁয়া— দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তা স্বীকার করুক বা না করুক। দূষণে রাশ টানতে হলে ধোঁয়ায় রাশ টানতে হবে। পুরোনো গাড়ি, যার ইঞ্জিন দুর্বল হয়ে এসেছে, সেই গাড়ি সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়ায়। সেইসব পুরোনো গাড়ি বাতিল করতে হবে। গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারলে এই সমস্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব। কিন্তু এ রাজ্যে তা কোনোভাবেই করা যাবে না।

২০০৯ সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একটি আবেদনের ভিত্তিতে কলকাতা হাই কোর্ট ১৫ বছরের পুরোনো যাবতীয় বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল করার নির্দেশ দেয়। বলা হয়, ওই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখবে পর্ষদ। নির্দেশে আরো বলা হয়েছিল, শহরের সমস্ত পেট্রোল চালিত অটো বাতিল করে গ্যাসের অটো চালু করতে হবে। আদালতের নির্দেশের দু-বছরের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি ট্যাক্সি এবং বাস বাতিল হয়ে যায়। সরকারি ভরতুকির ভিত্তিতে ৩০ হাজারের বেশি নতুন অটো রাস্তায় নামে। কিন্তু ওইসময় কলকাতায় বেআইনি অটো চলত প্রায় এক লাখ। তারা সরকারি সহায়তার আওতায় যেতে পারেনি। সরকারকে চাপ দিতে সেই অটোমালিকরা তদানীন্তন বিরোধী দলের নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত ঘেরাও করেন। আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ইতিমধ্যে পরিবর্তনের দমকা হাওয়ায় বামফ্রন্ট সরকারও কোনো কাজও আর করে উঠতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কাজের লোকদের সরিয়ে তোষামুদে পুতুলদের নিয়োগ করে। নয়া জমানার পর্ষদ জানিয়ে দেয়, গাড়ি বাতিল করা হচ্ছে কিনা তা দেখা তাঁদের কাজ নয়। পরিবহণ দপ্তর বলে, দু-বছর তো পুরোনো গাড়ি বাতিল হয়েছে, আবার কি! পুরোনো গাড়ি বাতিলের কাজটা আসলে বছর বছর করে যাওয়ার লাগাতার প্রক্রিয়া। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, কলকাতায় এখন যত হলুদ ট্যাক্সি চলে তার কোনোটারই রাস্তায় থাকার যোগ্যতা নেই। শহরের অন্তত ৬০ শতাংশ বাসেরও রাস্তায় থাকার কথা নয়। এ শহরে দূষণ আটকাবে কে? দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান দায়িত্ব সরকারের। সেই সরকারই যদি চোখে পট্টি বেঁধে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রবলতর হবে মারণ-বায়ু, বাড়বে দুর্ভোগ, বাড়তে থাকবে মৃতের সংখ্যা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation বা WHO)-র করা হালের একটি সমীক্ষা থেকে বায়ুদূষণের সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং মৃত্যুর সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়েছে। হু জানাচ্ছে, প্রতি বছর বিশ্বে পাঁচ বছর বয়স হতে হতে যত শিশু মারা যায় তার সিকি অংশের মৃত্যুর কারণ দূষিত পরিবেশ। ভারত এবং ভারতের মতো নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোয় এই বয়সের ৯৮ শতাংশ শিশুই বায়ুদূষণের শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে এই তথ্য জানিয়েছে। হু-র রিপোর্ট বলছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ শিশুর (যাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে), মৃত্যুর কারণ বায়ুদূষণ।

জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর ১৮ শতাংশ মানুষের বাস ভারতে। আর বিষ-বায়ুতে ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার হিসেবে প্রায় দ্বিগুণ জায়গা জুড়ে আছে আমাদের দেশ। সারা বিশ্বে যত মানুষ ফুসফুসের সমস্যায় ভোগেন, তার ৩২ শতাংশ ভারতীয়। ২০১৬ সালে ভারতে ১০.৯ শতাংশ মৃত্যুর কারণ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। সেটা হল দেশে মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ। এ দেশের মানুষের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় হৃদ্‌যন্ত্রজনিত রোগে। কয়েক মাস আগেই একটি রিপোর্টে জানিয়েছিল হু। সবাই জানে, ফুসফুসের সংক্রমণের সবচেয়ে বড়ো কারণ অবশ্যই বায়ুদূষণ। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ) রোগ। তাদের এক তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়েছেন বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা থেকে। ২৫ শতাংশ হয় ঘরের এবং তার আশেপাশের দূষণ থেকে। ২১ শতাংশের জন্য দায়ী ধূমপান। দেশের স্বাস্থ্যনীতি মেনে ২০১৭ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল, যে-সমস্ত কারণে অপরিণত বয়সে মৃত্যু হচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে তা ২৫ শতাংশ কমানো হবে।

হু-র সমীক্ষা বলছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রতিবছর অন্তত ৫ লাখ ৭০ হাজার শিশু মারা যায় শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণের জন্য। ৩ লাখ ৬১ হাজার মারা যায় দূষিত জল থেকে হওয়া ডায়েরিয়ায়। ২ লাখ ৭০ হাজার শিশু প্রথম মাসেই মারা যায় অপরিণত বয়সে জন্মের কারণে। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে ২ লাখ শিশু মারা যায় ম্যালেরিয়ায়।

আগেই বলেছি, বাতাসের গুণগত মান পরিমাপ করা হয় পরিবেশে উপস্থিত বস্তুকণার ঘনত্বের ভিত্তিতে। ভারতের মতো দেশে পিএম-২.৫-বাহী বাতাসের সংস্পর্শে আসে ৯৮ শতাংশ মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু। তুলনায় উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের মাত্র ৫২ শতাংশ এই বিষ-বায়ুর সংস্পর্শে আসে। আগেই বলা হয়েছে, বাতাসে পিএম ২০-এর চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক পিএম-২.৫। শিশুমৃত্যুর অন্যান্য কারণের মধ্যে দূষিত পরিবেশ সবচেয়ে সাংঘাতিক। শিশুদের ছোটো শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সবকিছুই খুবই কোমল। দূষিত বায়ু আর জলের সংস্পর্শে তারা মোটেই সুরক্ষিত নয়। এই ক্ষতি শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকেই। যার ফলে অপরিণত শিশুর জন্ম হয় এবং তারপর জটিলতা বাড়তে থাকে। তা ছাড়া দুধের শিশু থেকে শুরু করে স্কুলে যেতে শুরু করা বাচ্চারা বায়ুদূষণের সহজ শিকার। ঘরে-বাইরে দূষিত বায়ু, ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে ভরে নেয় তারা। 'চাইল্ডহুড

নিউমোনিয়া', শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় আক্রান্ত হয় তারা। দেখা দেয় হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি।

ধূমপানের থেকেও বেশি রোগ ডেকে আনছে বায়ুদূষণ। শুধু তাই নয়, রোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে, তেমনই দূষণের জেরে মানুষের আয়ু কমছে। এ দেশে প্রতি আটটি মৃত্যুর একটি ঘটে বায়ুদূষণের কারণে। দেশের প্রতিটি রাজ্যে বায়ুদূষণের জেরে মৃত্যু, রোগ, আয়ু সংক্রান্ত ইন্ডিয়া স্টেট লেভেল ডিজিজ বার্ডেন ইনিশিয়েটিভের রিপোর্টে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্যই মিলেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর), পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া (পিএইচএফআই) ও ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন (আইএইচএমই)-এর যৌথ উদ্যোগই হল ইন্ডিয়া স্টেট লেভেল ডিজিজ বার্ডেন ইনিশিয়েটিভ।

এদিকে দিল্লির পরিবেশের হাল ফেরাতে এবার সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে। ১৫ বছর বা তার বেশি পুরোনো পেট্রোল গাড়ি ও ১০ বছরের বেশি পুরোনো ডিজেল গাড়ি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লির বায়ুদূষণের হাল দেখে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি পরিবহণ দপ্তরকে এই নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে বলেছে। সেখানে সাধারণ মানুষ পরিবেশ দূষণ নিয়ে তাঁদের অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন।

তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একই রকম ভূমিকা পালন করে চলেছে। অরণ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহারের নামে কেন্দ্রীয় সরকার গাছ কাটার দেদার অনুমতি দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সে কাজে পিছিয়ে নেই। এখানে আবার সঙ্গে 'অনুপ্রেরণা' থাকায় গাছ কাটা এবং জলাভূমি ভরাট করার ব্যাপারে মন্ত্রীরা পর্যন্ত সক্রিয়। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ভরাট করে 'উন্নয়ন' আর রাস্তা চওড়া করা এবং ফ্লাই ওভার করার নামে যশোর রোডের দু-পাশে শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলো কেটে ফেলার চেষ্টা করছে স্বয়ং প্রশাসন। আদালতের নির্দেশে যশোর রোডের গাছ কাটা আপাতত বন্ধ থাকলেও একই যুক্তিতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে লাটাগুড়ির কাছে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রাচীন গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।

শেষপর্যন্ত সেই আদালতই ভরসা। বায়ুদূষণ রোধে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার দায়ে রাজ্য সরকারকে সম্প্রতি পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। দু-সপ্তাহের মধ্যে ওই জরিমানা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতা এবং হাওড়ার দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে ২০১৬ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটা মামলা হয়। কলকাতার দূষণ কমানোর জন্য তখন বেশকিছু নির্দেশ দিয়েছিল আদালত সেই নির্দেশ অমান্য করে রাজ্য। ফের পরিবেশ আদালতে আবেদন করা হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ নিয়ে রাজ্য সরকারের এহেন ভূমিকার বিরুদ্ধে ছোটো-বড়ো আন্দোলন গড়ে উঠছে। জেলা শহর এবং গ্রামের পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠনগুলো নিজেদের উদ্যোগে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। বড়ো কোনো লড়াই শুরু করার আয়োজন নিশ্চয়ই। আর একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, পরিবেশ আসলে একটি রাজনৈতিক বিষয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রশমনে আমেরিকার ভূমিকা কিংবা পরিবেশ নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের বিবাদ সংঘাত সেটাই প্রমাণ করে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। অকারণে কিংবা সামান্য কারণে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে, দেদার এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করে সম্পন্নরা যে দূষণ সৃষ্টি করে তার দায় কেন নিম্নবিত্ত পরিবারে শিশু নেবে তার জীবন দিয়ে— এ সংকট অবশ্যই রাজনৈতিক। অথচ আমাদের দেশে বাম ডান কোনো রাজনৈতিক দলই পরিবেশকে তাদের ভাবনার মধ্যে রাখেনি। এমনকী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহুজাতিক সংস্থাগুলো যখন পাহাড় এবং অরণ্য ধ্বংস করে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা বা সংস্কৃতি বিপন্নতার মুখে ঠেলে দেয়, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কোনো রাজনৈতিক দলের দেখা মেলে না।

পরিবেশ আন্দোলন কি কেবল কিছু পরিবেশকর্মী বা বিজ্ঞানীর কাজ? পরিবেশ দূষণ যতদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা না যাবে ততদিন এ দেশের মানুষকে দূষণ থেকে মুক্তির জন্য কেবল আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

আতশকাচে মোদী সরকার

মোদী সরকারের পাঁচ বছর প্রায় অতিক্রান্ত। গত পাঁচ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর মুখে প্রচুর বড়ো বড়ো কথা শোনা গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কতটা হয়েছে? পাঁচ বছর আগে নির্বাচনের প্রাক্কালে যে-সমস্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজ তার কী পরিণতি হয়েছে? ভারতের অর্থব্যবস্থা এবং সমাজ বিগত পাঁচ বছরে কতটা পিছিয়েছে, 'আচ্ছে দিন'-এর খোয়াবের কী হল? এই প্রশ্নগুলির জবাব তালাশ করা হবে এই কলামে। প্রথম কিস্তির বিষয় 'কর্মসংস্থান'।

কর্মসংস্থানের সংকট

শুভনীল চৌধুরী

নরেন্দ্র মোদী, ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর সরকার বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান করবে। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত প্রায়। দেশের যুব সম্প্রদায়ের একটি বড়ো অংশ যেই চাকরির আশায় মোদীকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন কতটা পূরণ হয়েছে? তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যেক ত্রৈমাসিক দেশের ১৩টি শহরে সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবারে নমুনা সমীক্ষা করে থাকে অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা কী তা নিয়ে। কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা নিয়েও সেখানে প্রশ্ন করা হয়। এই তথ্যভাণ্ডার থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। যেমন, ২০১৪ সালের জুন মাসে ৩০.২ শতাংশ মানুষ মনে করতেন যে কর্মসংস্থান আগের থেকে বর্তমানে খারাপ হয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৭.২ শতাংশ। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রতি দুইজন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ মনে করেন যে কর্মসংস্থান আগের থেকে খারাপ হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নোট বাতিলের সময় থেকে কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের এই হতাশা লাগাতার বেড়েছে। যদি অর্থ ব্যবস্থায় অধিকতর মানুষ চাকরির সুযোগ পেতেন তবে নিশ্চিতভাবেই এই করুণ চিত্র ফুটে উঠত না।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সরকারি তথ্য

মুশকিল হচ্ছে যে আমাদের দেশে সরকারিভাবে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংগ্রহ করা হয় ও প্রকাশ করা হয়, যা করে থাকে দেশের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা। ২০১১-১২ সালে শেষবার এই সমীক্ষা করা হয়। আবার শ্রম দপ্তরের অধীন লেবার ব্যুরো আরেকটি সমীক্ষা করে ২০০৯-১০ সাল থেকে। ২০১৫-১৬ সালে শেষবার এই সমীক্ষা করা হয়। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে দুটি সমীক্ষাই বন্ধ করে দিয়েছে। তার বদলে নতুন পদ্ধতিতে যে সমীক্ষার সুপারিশ নীতি আয়োগ করেছে, তা কবে হবে এবং তার রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে তা একমাত্র মোদীই জানেন। অতএব, আপাতত সরকারিভাবে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য ২০১৫-১৬ সাল অবধিই পাওয়া যাচ্ছে।

মোদীর জন্য মুশকিল হচ্ছে এই যে ২০১৫-১৬ সালের যেই তথ্য আমাদের কাছে আছে তার ভিত্তিতে কেরালার অর্থনীতিবিদ ভিনোজ এব্রাহাম দেখাচ্ছে যে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে দেশে ৩৭.৪ লক্ষ চাকরি হ্রাস পেয়েছে।[১] আবার দিল্লির অর্থনীতিবিদ রাধিকা কাপুর, একই তথ্যের ভিত্তিতে ভিন্নভাবে গণনা করে দেখাচ্ছেন যে এই দুই বছরের মধ্যে দেশে কর্মসংস্থান কমেছে ১.২৮ কোটি।[২] অর্থাৎ, যদিও সংখ্যার বিশাল তারতম্য রয়েছে তবু অর্থনীতিবিদরা এই বিষয়ে একমত যে ২০১২-১৩ এবং ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে দেশে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান কমেছে।

২০১৬ সালের পর সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান নিয়ে কোনো কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মোদীকে রুখিবে কে? অতএব, প্রায় রাতারাতি বলা হল যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের তথ্য থেকে কর্মসংস্থানের হিসেব দেওয়া হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বিগত এক বছর ধরে ইপিএফও সংস্থায় নথিবদ্ধ কর্মীদের

সংস্থা, বিশেষ করে নতুন নথিকরণের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের আকাশকুসুম গল্প মানুষকে শুনিয়েছেন মোদী এবং তাঁর বশংবদ অর্থনীতিবিদরা। মুশকিল হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে নথিকরণের ভিত্তিতে চাকরির সংখ্যা মাপা বোকামি। কারণটি সহজ। প্রভিডেন্ট ফান্ডে নথিকরণ করা আবশ্যিক সেইসমস্ত সংস্থার ক্ষেত্রে যেখানে ২০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে। ধরুন একটি সংস্থায় ১৯ জন শ্রমিক কাজ করতেন। এখন ২০ জন কাজ করেন। তাহলে নতুন কর্মসংস্থান হল এক জনের। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থায় নথিভুক্ত হলেন ২০ জন নতুন শ্রমিক। যদিও-বা নতুন কর্মসংস্থান হল মাত্র একজনের, শুধুমাত্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের তথ্যের দিকে তাকালে মনে হবে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ জনের। তদুপরি, বিভিন্ন সরকারি স্কিমের ফলে প্রফিডেন্ট ফান্ডে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, যার সঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার আমরা যদি শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ডে নথিভুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার দিকে তাকাই, তাহলেও মোদী ফানুস চুপসে যাবে। তথ্য বলছে যে, সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮-র মধ্যে প্রভিডেন্ট সংস্থায় নতুন নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১.৫৭ কোটি। একইসময় ১ কোটি শ্রমিকের নাম প্রভিডেন্ট সংস্থার খাতা থেকে বাদ গেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কোনো বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়— এই কথা দেশের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরই বলছে। কিন্তু মোদী ও তাঁর সহযোগীরা থোড়াই কেয়ার করেন। তাঁরা এই ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে যথারীতি ঢাক পিটিয়ে চলেছেন যে প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বেসরকারি তথ্য

যদিও সরকারের তরফ থেকে ২০১৬ সালের পরে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেন্টার ফর মনিটরিং দি ইন্ডিয়ান ইকোনমি (CMIE) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা ২০১৬ সাল থেকে নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য— বার্ষিক, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক— ভিত্তিতে নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে। মোদী সরকারের আমলে কর্মসংস্থানের প্রকৃত চিত্র বুঝতে হলে এই তথ্যভাণ্ডারের আশ্রয় নেওয়া ব্যতিরেকে আর কোনো উপায় নেই। CMIE-র তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কিছু তথ্য সারণি ১-এ দেওয়া হল।

সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৬-১৭ সাল থেকে ভারতে কর্মরত মানুষের এবং শ্রমশক্তির (কর্মরত এবং কর্মপ্রত্যাশী মানুষের যোগফল) সংখ্যা লাগাতার কমছে। বেকার মানুষদের সংখ্যা ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় কমেছে ঠিকই, কিন্তু এই কমার নেপথ্যে কী আছে তা বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। আপাতত বলা যেতে পারে যে, কর্মের অভাবে বহু মানুষ শ্রমের বাজারে আর অংশগ্রহণ করছেন না, যার ফলে শ্রমশক্তির সংখ্যাই হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১: ভারতে কর্মসংস্থানের অবস্থা (সংখ্যা কোটিতে)

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮Q1	২০১৮-১৯Q1
কর্মরত	৪০.৬৭	৪০.৬২	৪০.৬২	৪০.১৯
চাকরির প্রত্যাশী বেকার	৩.৩	১.৯৯	১.৭	২.৩৬
শ্রম শক্তি	৪৩.৯৭	৪২.৬১	৪২.৩৩	৪২.৫৫

সূত্র: CMIE
বি.দ্র. Q1 অর্থাৎ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)

অন্যদিকে, ২০১৭ এবং ২০১৮-র বিভিন্ন মাসের তুলনামূলক ছবি তুলে ধরা হল সারণি ২-এ। সারণি ২-এ দেখা যাচ্ছে যে ২০১৭-র তুলনায় ২০১৮ সালের প্রত্যেকটি মাসে কর্মরত মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে কমেছে (জুলাই ব্যতিরেকে)। অর্থাৎ, দেশে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে কর্মসংস্থানের সংকট সুগভীর হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা রিপোর্ট আমাদের জানাচ্ছে যে মানুষ ইতিমধ্যেই মনে করছেন যে কর্মসংস্থানের অবস্থা অর্থ ব্যবস্থায় খারাপ হয়েছে। এমতাবস্থায়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মোদীর কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিতে বাধ্য।

সারণি ২: ২০১৭ ও ২০১৮-র বিভিন্ন মাসে কর্মরত মানুষের সংখ্যা

মাস	কর্মরত মানুষের সংখ্যা (কোটি)
জুলাই ২০১৭	৪০.৩২
জুলাই ২০১৮	৪০.৫২
আগস্ট ২০১৭	৪০.১৭
আগস্ট ২০১৮	৩৯.৯২
সেপ্টেম্বর ২০১৭	৪০.৬৪
সেপ্টেম্বর ২০১৮	৪০.৪৫
অক্টোবর ২০১৭	৪০.৭
অক্টোবর ২০১৮	৩৯.৭২
নভেম্বর ২০১৭	৪০.৯৫
নভেম্বর ২০১৮	৪০.২৩

সূত্র: CMIE

বেকারত্বের হারের তথ্যের দিকে তাকালে মোদীর চিন্তা আরো বাড়বে। চিত্র ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জুলাই ২০১৭ অবধি বেকারত্বের হার কমলেও তারপর থেকে এই হার লাগাতার বাড়ছে। বাড়তে থাকা বেকারত্বের হার, কমতে থাকা কর্মরত মানুষের সংখ্যাই মোদী সরকারের আমলে কর্মসংস্থানের আসল চিত্র।

চিত্র ১: ভারতে বেকারত্বের হার

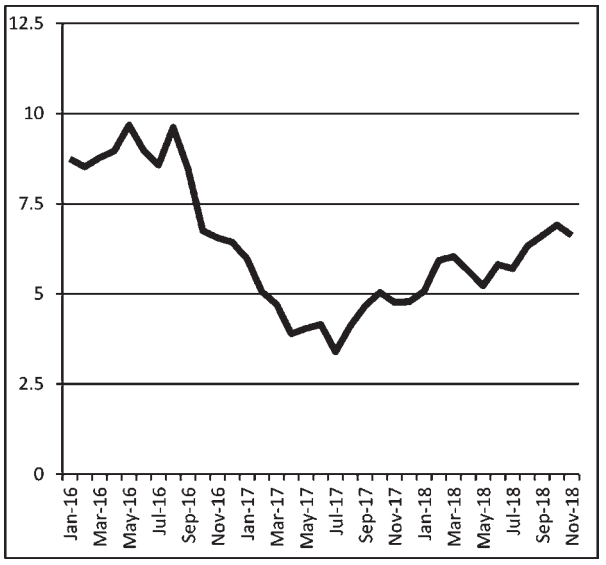

সূত্র: CMIE

উপসংহার

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে মোদী কর্মসংস্থান নিয়ে যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনোটাই ধোপে টেকেনি। বরং তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের যুব সমাজ কর্মসংস্থানের সংকটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মন্দির-মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান, হনুমানের জাত, গণেশের প্লাস্টিক সার্জারির মতন বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে এসে সংঘ পরিবার এবং বিজেপি কর্মসংস্থান, কৃষি সংকট, বেকারত্বের মতন বিষয়গুলি থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে। কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনে দেশের মানুষ তথা যুব সমাজ মোদী ও বিজেপি-র থেকে জবাব চাইবে যে কেন নানান প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল কিন্তু কর্মসংস্থানের সমস্যা সুরাহা করার কোনো চেষ্টা করা হল না। মোদীর ভাঁওতাবাজির যোগ্য জবাব দেওয়া হবে এই জনবিরোধী সরকারকে পরাজিত করা।

তথ্যসূত্র

১. Abraham, V. (2017). 'Stagnant Employment Growth: Last Three Years May Have Been the Worse', *Economic and Political Weekly*, Vol. 52 (38), page: 13-17

২. Kapoor, R. (2017). 'Working for Jobs', Working Paper No. 348, Indian Council for Research on International Economic Relations, November (http://icrier.org//pdf/working Paper 348.pdf.)

ফিরে দেখা: ৬ নভেম্বর, ১৯৪৭

শেখর দাশ

সম্রাট অশোকেরও বহু আগে থেকেই কাশ্মীর বুদ্ধের শরণাগত ছিল। শুধু বৌদ্ধ শাসকরাই নন, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তখনকার কাশ্মীরের সমস্ত শাসকেরাই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে বৌদ্ধচর্চায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কাশ্মীর, জম্মু ও তার সংলগ্ন হিমালয়ের বহু বিস্তীর্ণ জনপদ। কালে কালে বৌদ্ধচর্চা দুর্বল হয়ে পড়লে শুরু হয় শৈব ধর্মের চর্চা। দীর্ঘকাল দুই ধর্ম পাশাপাশি চলার পর একসময় শৈবচর্চা প্রবলতর হয়ে ওঠে। তারপর আসে ইসলামের কাল। দু-আড়াই-শো বছরের এক রাজনৈতিক অস্থিরতার ঋতু কাটবার পর কাশ্মীরে মুসলিম শাসনকে প্রতিষ্ঠা দেন শাহ মীর, সে-ই ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকেই শাসকের সক্রিয় উদ্যোগে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপত্যকায়। শাহ্ বংশ, মুঘল ও তারপর আফগানদের ধরে প্রায় পাঁচ-শো বছর কাশ্মীর মুসলিম শাসনের অধীনে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে ইসলাম হয়ে ওঠে আধুনিক কাশ্মীরের প্রধান ধর্ম। গত প্রায় সাত-শো বছর ধরে ইসলামের আশ্রয়েই কাশ্মীরের বেশিরভাগ মানুষই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের জীবন-জেহাদ। কাশ্মীরের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা কিছুটা কম হলেও জম্মুতে ইসলামই প্রধান ধর্ম।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই কাশ্মীর ও তার আশপাশের জনপদগুলো এক অতি আকর্ষণীয় অঞ্চল। শুধু তাই-ই নয়, কাশ্মীর ও তার সংলগ্ন সংকীর্ণ পাহাড়ি পথগুলোই হয়ে উঠেছিল ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া তথা বহির্বিশ্বের যোগাযোগের প্রধান সড়ক। ফলে, ওই অঞ্চল হয়ে উঠেছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ এক বাণিজ্য করিডর। তাই যুগে যুগে রাজন্যবর্গ ওই অঞ্চলকে দখলে পাবার জন্য বারে বারে রক্ত-ঝরা যুদ্ধে মেতে উঠেছিলেন। যেমন মেতেছিলেন শের-ই-পাঞ্জাব রঞ্জিত সিংহ-ও।

আফগান শাসকদের হাত থেকে নিজের কবজায় আনতে রঞ্জিত সিংহ তিন-তিন বার কাশ্মীর আক্রমণ করেন। শেষ যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থন এবং সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ব্রিটিশরা মনে করেছিল, আফগানদের কবজা করে রাশিয়ার জার সম্রাট কাশ্মীর তথা ভারতেও তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। রঞ্জিত সিংহ তখন শুধু সমগ্র পাঞ্জাব নয় একেবারে আফগানিস্তানের সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছেন— আফগান এবং ইংরেজ উভয়েরই তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' ওই দর্শনে বিশ্বাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাই আফগানদের চাপে রাখতে এবং কাশ্মীর থেকে হঠাতে রঞ্জিত সিংহ-কেই বাজি ধরেছিল। রঞ্জিত সিংহ প্রমাণ করেছিলেন কোম্পানি লোক চিনতে ভুল করেনি। ১৮১৯-এ আফগানদের হারিয়ে তাঁর স্বপ্নের কাশ্মীরকে শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন রঞ্জিত।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ রঞ্জিত সিংহের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে গুলাব সিং ডোগরা নামের এক যোদ্ধা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। জম্মুর জামওয়াল বংশীয় ওই রাজপুত সৈনিক বীরত্বের কারণেই মহারাজের লাহোর রাজসভায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিলেন। দূরত্বের কারণে লাহোর থেকে জম্মু শাসন করা রঞ্জিত সিংহের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল, তাই সেখানে শিখ কর্তৃত্ব স্থায়ী করতে রঞ্জিত সিংহ ১৮২২-এ অনুগত এবং উচ্চাভিলাষী গুলাব সিংহ-কে জম্মুর বংশানুক্রমিক রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেন। গুলাব সিংহ প্রমাণ করেছিলেন রঞ্জিত সিংহ লোক চিনতে ভুল করেননি।

রঞ্জিত সিংহ কাশ্মীরকে শিখ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্তই রেখেছিলেন। অনুগত সেনা-আধিকারিকের মারফতই তিনি কাশ্মীরকে শাসন করতেন। আমরা জানি, রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে আপাত-বন্ধুতা থাকলেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্মিলিত শিখ-শক্তিকেই একটা বড়ো বাধা হিসেবে মনে করত। রঞ্জিত সিংহ মারা গেলে শিখ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব শিখ-শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ব্রিটিশ তখন থেকেই ধীরে ধীরে পাঞ্জাব দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে— শিখদের বিরুদ্ধে চালাতে থাকে একের পর এক যুদ্ধ।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের শেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং

শিখবাহিনীর মধ্যে লাহোরে এক চুক্তি হয়। চুক্তিতে যুদ্ধের খরচ বাবদ শিখবাহিনী ব্রিটিশকে দেড় কোটি টাকা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিন্তু নগদে ওই পরিমাণ অর্থ দেয়ার ক্ষমতা রঞ্জিত সিংহের উত্তরাধিকারীদের ছিল না। তাই বিকল্প হিসেবে তারা কাশ্মীর সমেত বেশ কিছু অঞ্চল কোম্পানির হাতে তুলে দিল। কোম্পানি তখন ৭৫ লাখ টাকায় কাশ্মীরকে জম্মুর রাজা গুলাব সিংহের কাছে বেচে দেয় এবং তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে গুলাব সিংহ অর্থের বিনিময়ে কোম্পানির সঙ্গে গোপন সমঝোতা করেছিলেন। সেই সমঝোতার বলে বলীয়ান হয়ে গুলাব সিংহ শিখবাহিনীকে হারিয়ে কাশ্মীরকে নিজের দখলে আনেন। ঘটনা যাই হোক, ১৮৪৬ সালে অমৃতসরে এক চুক্তির ফলে জম্মুর মহারাজা গুলাব সিংহ কাশ্মীর, লাদাখ এবং বালতিস্তানেরও রাজা হলেন।

গুলাব সিংহের মতো পাহাড়ি-যুদ্ধে দক্ষ এক শাসকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয়ার ফলে উত্তর দিক থেকে ভারত দখলের ভয় ব্রিটিশের কেটে গিয়েছিল। গুলাব সিংহ এবং তাঁর বংশধরেরাও— রণবীর সিংহ, প্রতাপ সিংহ এবং হরি সিংহ কোম্পানির সেই দায়িত্বের মর্যাদা ১৯৪৭ পর্যন্ত রেখেছিলেন। শুধু বাইরের শত্রু ঠেকানোই নয়, দেশের ভেতরের সংকট কালেও, যেমন, ১৮৫৬-র মহাবিদ্রোহ (সিপাহি বিদ্রোহ) দমনে বা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালে তাঁরা উপযুক্ত বন্ধুর মতোই ব্রিটিশ-কোম্পানির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আনুগত্যের বিনিময়ে ডোগরাবংশ জম্মু-কাশ্মীরকে শাসন (শোষণ) করার প্রায় বাধাহীন এক অধিকার পেয়েছিল।

ডোগরারা জম্মুর মানুষ— জম্মু ছিল তাঁদের নিজেদের দেশ। কাশ্মীর বা অন্য অঞ্চলগুলো ছিল অধিগৃহীত। তাই আর পাঁচটা শাসনবাহিনীর মতোই ডোগরা শাসকেরাও অধিগৃহীত অঞ্চলের ওপরই বেশি উৎপীড়ন চালিয়েছিলেন। আগের আফগান, মুঘল বা শিখ শাসকদের হাতে লাদাখ, বালতিস্তান এবং কাশ্মীরের মানুষজন শোষিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ডোগরা শোষণের বীভৎসতা দুনিয়ার ইতিহাসে অতি বিরল। কাশ্মীরের ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ মুসলিম— তাঁদের শোষণ করেই ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল শাসক এবং তার স্বধর্মী রাজকর্মচারীগণ। জম্মুতেও শোষণের মূল লক্ষ্য ছিলেন মুসলিমরা। শাসক হিন্দু হওয়ার ফলে, সরকারি চাকুরি বা প্রশাসনের সব স্তরে প্রধানত হিন্দুরা-ই সুযোগ পেতেন। মুসলিমদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষিজীবী। তাঁদের জমিতে বীজ বোনার সময়েই রাজস্ব-অধিকারিকরা রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজস্ব আদায়ের কালে ওই বিধর্মী চাষিদের প্রতি প্রবল দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের কোনোরকম সহানুভূতিই কাজ করত না। শাসক এবং তার কর্মীদের খাঁই মিটিয়ে হতদরিদ্র মানুষদের হাতে সামান্যই ফসল উদ্‌বৃত্ত থাকত। তাতে সারাবছর পরিবারের সবার পেটে ভাত জুটত না। ফলে, প্রবল শীতে যখন চাষ হত না, তখন বাড়ির পুরুষেরা কাজের খোঁজে বাইরে চলে যেতেন। তবে ডোগরা যুগে জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিমদের সকল দুর্দশাকে বোধহয় ছাপিয়ে গেছিল *বেগারশ্রম* প্রথা। ডোগরা আইন মোতাবেক সরকারি আধিকারিকেরা যেকোনো মানুষকে যেকোনো কাজের জন্য বিনা-মজুরিতে খাটিয়ে নিতে পারতেন। আপত্তি বা প্রতিবাদ জানানোর কোনো উপায় ছিল না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষগুলোকে ক্রীতদাসের মতো ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে পাশবিক পরিশ্রমের কাজে লাগিয়ে দেয়া হত। শুধু মজুরি নয়, তাঁরা খাবারও পেতেন না। ওই অমানবিক পরিশ্রমের (অত্যাচারের) ফলে অনেকেই আর বাড়িতে বেঁচে ফিরতেন না। তাই *বেগার* খাটার জন্য ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই হতভাগাদের স্ত্রী-সন্তান-পরিজনেরা ভাবতেন ওই মানুষটার সঙ্গে আর দেখা হবে না, চোখের জলেই তাঁকে শেষ বিদায় জানাতেন!— শেষ ডোগরারাজ হরি সিংহ অত্যাচারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন! হয়তো পূর্বপুরুষদের ছাপিয়েই গেছিলেন! তিনি ১৯৪৭ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ গুলাব সিংহ কাশ্মীর কিনেছিলেন ১৮৪৬-এ অর্থাৎ সেই ১৮৪৬ থেকে ১৯৪৭— প্রায় ১০০ বছর ধরে কাশ্মীরের এবং তারও আগে থেকে জম্মুর লাখ লাখ মুসলিম প্রায় ক্রীতদাসের জীবনযাপন করেছেন। শাসকের অস্ত্রের সামনে মাথা নীচু করে সহ্য করেছেন চরম অত্যাচার, মুখ বুজে এক মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। ওই যাপনের মধ্যেই মানুষের মধ্যে তিলে তিলে জমা হয়েছিল ক্ষোভ। আগুন। সেই আগুনকে চিরতরে নিভিয়ে দিতে যে বীভৎস ইতিহাস নির্মাণ করেছিলেন হরি সিংহ ও তাঁর দোসররা সেই আলোচনাতে পরে আসছি।

১৯৪৭-এ ব্রিটিশ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতভাগ এবং ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। জম্মু-কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদের মতো তখন ভারতে প্রায় ৬০০ 'স্বাধীন' রাজ্য ছিল। ব্রিটিশরা ঘোষণা করল ওই স্বাধীন রাজ্যগুলো নিজেরাই ঠিক করবে তারা কোনদিকে যাবে— ভারতে, নাকি পাকিস্তানে। পরামর্শ হিসেবে ব্রিটিশ বলেছিল পক্ষ বাছাইয়ের সময় যেন অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক সুযোগ-সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখার পাশাপাশি মানুষের মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ব্রিটিশের ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্তে হরি সিংহ অসহায় হয়ে পড়লেন। কেননা, সম্পর্কের টানা-পোড়েন থাকলেও ডোগরা-রাজবংশ ব্রিটিশের কাছ থেকেই পেয়েছিল যাবতীয়

নির্ভরতা, নিরাপত্তা— পেয়েছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্যের (অত্যাচারের) অধিকার। ব্রিটিশ চলে গেলে সেই আধিপত্য, অধিকার থাকবে না। কারণ, ভারত বা পাকিস্তান যেকোনো পক্ষে যোগ দিলে জম্মু-কাশ্মীর তখন সেই দেশের অঙ্গরাজ্য হয়ে যাবে। খসে পড়বে রাজমুকুট। সংকটের আরেকটা দিক ছিল, শেষপর্যন্ত যদি কোনো পক্ষে যোগ দিতেই হয় তাহলে কোন দিকে যোগ দেবেন হরি সিংহ— ভারত নাকি পাকিস্তান? ডোগরা বংশের চিরন্তন মুসলিম বিদ্বেষের ধারা অনুযায়ী হরি সিংহের ভারতের দিকে ঝুঁকে থাকাটা স্বাভাবিক। আবার, জম্মু-কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম— তাঁদের পক্ষে মহারাজের ইচ্ছে মেনে নেয়া ছিল অস্বাভাবিক। কারণ, প্রথমত, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়াটা জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিমদের পক্ষে দোষের ছিল না। দ্বিতীয়ত, জম্মু-কাশ্মীরের সব-হারানো, নিঃস্ব রিক্ত মুসলিমরা পাকিস্তান-সম্ভাবনার মধ্যে যেন মুক্তির ইশারা পেয়েছিলেন। হিন্দু শাসকের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দমবন্ধ মানুষগুলোর কাছে পাকিস্তান-সম্ভাবনা ছিল এক বিশুদ্ধ বাতাসের হাতছানি। মানুষের মনের ওই কথা, '৪৭-এর এপ্রিল মাসেই নিজের কানে হরি সিংহ শুনে এসেছিলেন। ওইসময় তিনি রাজ্য সফরে বেরিয়েছিলেন। মানব-মনের গতিবিধি আন্দাজ করে তিনি এক নতুন চাল দিলেন— তিনি স্বাধীন থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেলেন। কিন্তু রাজার ইচ্ছেকে ভারত বা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসকবৃন্দ কোনো গুরুত্ব তো দিলেনই না, বরং নিজের নিজের পক্ষে টানার জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন। ডোগরা-রাজ তখন ভারত এবং পাকিস্তানকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান। অর্থাৎ, যতদিন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততদিন জম্মু-কাশ্মীর কোনো দেশের সঙ্গে যোগ দেবে না, স্বাধীনভাবেই থাকবে। ভারত রাজি না হলেও পাকিস্তান ওই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। জম্মু-কাশ্মীরের ওই টানা-পোড়েনের কালেই ভারত ভাগ হয়ে গেল। তার কিছুদিন পরেই— আমাদের স্কুল-কলেজের ইতিহাস বই থেকে জানতে পারি— অক্টোবর মাসে পাকিস্তান (বা, তাদের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিরা) কাশ্মীর আক্রমণ করে। হতভম্ব, অসহায় হরি সিংহ ওই আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্তির পর ভারত সরকার ২৭ অক্টোবর ('৪৭) সেনা পাঠায়। দুষ্কৃতিরা পরাস্ত হলেও পাকিস্তান কাশ্মীরের ওপর দাবি ছাড়ে না। যুদ্ধ লাগে দু-দেশের মধ্যে। তারপর বিষয়টা রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত গড়ায়। রাষ্ট্রসংঘে স্থির হয় এক স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ গণভোটের মারফত জম্মু-কাশ্মীরের মানুষেরা ঠিক করবেন তাঁরা ভারত নাকি পাকিস্তান কোন দিকে যাবেন (ইউএনসিআইপি রেজোলিউশন: ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৯)। তারপর তো আরো যুদ্ধ, চুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদির কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু সেই জানা ইতিহাসের আড়ালে আরেকটা ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে— '৪৭-এর ১৫ আগস্টের আগে-পরে জম্মু-কাশ্মীরের, বিশেষ করে জম্মুতে যে মর্মান্তিক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, সেই চাপা-পড়া ইতিহাসে আলো ফেলাটা খুব জরুরি বলে আমাদের মনে হয়। বিশেষ করে আজকের জম্মু-কাশ্মীরের সংকট-সমস্যার গতি-প্রকৃতি অনুভব করতে গেলে সেই ইতিহাস জানাটা আবশ্যক।

প্রকাশ্যে স্বাধীনতা বা স্থিতাবস্থা চাইলেও হরি সিংহ তার প্রজাদের বিরুদ্ধেই তখন এক গোপন ষড়যন্ত্র আঁটছিলেন। উদ্দেশ্য জম্মু-কাশ্মীরকে মুসলিম-মুক্ত করা। সম্পূর্ণ জাতি নির্মূলীকরণ। কারণ, মুসলিম-মুক্ত হলে বা মুসলিমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে তখন বেশিরভাগ মানুষের ইচ্ছেতেই, এমনকী গণভোট হলে মানুষের ভোটেই জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে। কিন্তু, ১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুসারে জম্মুর ১৯ লাখের মধ্যে ১২ লাখ মানুষ ছিলেন মুসলিম আর কাশ্মীরে ১৭ লাখ মানুষের মধ্যে ১৬ লাখ ছিলেন মুসলিম। '৪৭-এ সেই সংখ্যা আরো বেড়েছিল। রাতারাতি অত মানুষকে কোতল করার মতো তীক্ষ্ণতা সেকালের অস্ত্রে ছিল না। তাই, সময় কিনতে স্বাধীনতা বা স্থিতাবস্থার আড়াল দরকার হয়ে পড়েছিল হরি সিংহের।

অবশ্য, ষড়যন্ত্রের শুরু '৪৭-এর আগস্টে নয়। আরো আগে থেকেই। ১৯৩২-এ জম্মুতে আরএসএস কাজ শুরু করে। তার দশ/বারো বছরের মধ্যেই বলরাম মাধোকের কর্মনৈপুণ্যে সম্পূর্ণ সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে আরএসএস-এর জাল ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় শুরু থেকেই আরএসএস তার চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক বিভাজনের খেলা খেলতে শুরু করে। '৪৭-এর এপ্রিলে রাজ্য সফরে বেরিয়ে হরি সিংহ যখন মানুষের মনোভাব বুঝতে পারলেন তখন থেকেই বেয়াড়া প্রজাদের শিক্ষা দেয়ার কাজ শুরু করলেন। আর সেই কাজে তাঁর প্রধান দোসর হয়ে উঠেছিল আরএসএস। প্রথমেই, মহারাজ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দিতে শুরু করলেন। তাদের ফাঁকা পদে নিযুক্ত করা হল ডোগরা অর্থাৎ হিন্দুদের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় চল্লিশ হাজার সেনা কাশ্মীর থেকে ইংরেজের হয়ে লড়তে গেছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফিরে এলেও তাঁদের অনেকের কাছেই কিছু অস্ত্র থেকেই গেছিল। যুদ্ধ-ফেরত মুসলিম সেনাদের ওই অস্ত্র থানায় জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। পরে সেই অস্ত্রই তুলে দেয়া হয় ডোগরা-হিন্দু, গোর্খা এবং শিখদের নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন নতুন সেনাব্রিগেডের হাতে। ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হয় হিন্দু

এবং শিখ জনসাধারণকে বিশেষ নিরাপত্তা দিতে। পুঞ্চ, মিরপুর, মুজফ্‌ফরাবাদের মতো মুসলিমপ্রধান জেলাগুলোতে ডোগরা সেনাবাহিনীর গতিবিধি বাড়তে থাকে। পাশাপাশি আরএসএস সক্রিয় থেকে সক্রিয়তর হতে থাকে। আরএসএস-এর গোপন শিবিরগুলোতে শুরু হয় অস্ত্রশিক্ষা। অস্ত্রের জোগান যেতে থাকে ডোগরা-সেনাভাণ্ডার থেকেই। ডোগরা-সেনা আধিকারিকেরাই অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকেন। শ্রীনগরের এক গোপন সভায় মহারাজ হরি সিংহকে কাপুরতলা এবং পাতিয়ালার মহারাজারা যথাকালে অস্ত্র এবং সেনা পাঠিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। আলোচনায় হাজির আরএসএস-এর নেতারাও জানান অমৃতসর থেকে আরএসএস-ঘাতকবাহিনী পৌঁছে যাবে গোপন অস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে। ঠিক ওইসময়, ১৫ আগস্টের আগে-পরে, র‍্যাডক্লিফের আঁকা পাকিস্তান-পাঞ্জাব থেকে মানুষের স্রোত জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকতে শুরু করে। তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শিখ। এমনিতেই শিখরা যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিচিত। যোদ্ধা-শিখদের অনেকের কাছেই অস্ত্র বা গোলাবারুদ মজুত থাকত। ওই গোলাবারুদ এবং উদ্‌বাস্তু শিখদের একটা বড়ো অংশ আরএসএস অস্ত্র-শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে আরো ভয়ানক করে তুলেছিল।

প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম হওয়াতে কাশ্মীরে ডোগরা সেনা বা আরএসএস-বাহিনীর কাজকর্মে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কিছুটা সম্ভাবনা থাকলেও জম্মুতে সেই সম্ভাবনা ছিল অনেকটাই কম। কারণ জম্মুতে হিন্দুদের সংখ্যা অনেকটা বেশি— মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ। আরএসএস বা মহারাজ বুঝেছিলেন কাশ্মীর থেকে ৯০ শতাংশ মানুষকে তাড়িয়ে বা খুন করে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করা এক অসম্ভব বা অতিদীর্ঘমেয়াদি কাজ। অত দীর্ঘসময় তাঁদের হাতে ছিল না। কেননা, কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরগরম হতে শুরু করেছিল। তাই আরএসএস এবং ডোগরা-শাসক বিশেষ নজর দিয়েছিলেন জম্মুতে। আগস্টের মাঝামাঝি ডোগরা সেনাবাহিনী আরএসএস-কে সঙ্গে নিয়ে সমগ্র জম্মু থেকেই মুসলিমদের তাড়াতে শুরু করে। সেটা ব্যাপক চেহারা নেয় সেপ্টেম্বরে। আরএসএস প্রধান গোলওয়ালকর তাঁর ক্যাডারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে। কাশ্মীরে সফল না হলেও জম্মুতে গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরএসএস-এর জল্লাদরা। গ্রাম-গঞ্জ-নগর প্রতিটি রাতে কেঁপে ওঠে শ্বাপদের উল্লাসে। নিরাপত্তার কারণে প্রশাসনের তরফে কার্ফু ঘোষণা করা হয়। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ আলো নিভিয়ে ঘরের মধ্যে আল্লাহ-র স্মরণ নিতে থাকেন। আর অস্ত্র-প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে জিপ বা অন্য কোনো গাড়িতে সওয়ার হয়ে আর সেনাবাহিনী-আরএসএস-এর যৌথবাহিনী দাপিয়ে বেড়াতে থাকে রাজপথ সড়ক গলিঘুঁজি। চলতে থাকে লুঠপাট। অবশ্যই মহিলাদের সম্মানহানিও। সামান্য প্রতিরোধেই হতে থাকে খুন। হাজার হাজার পরিবার, মহল্লার পর মহল্লা, শত শত গ্রাম/শহর সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে যায়। যেমন রেয়াসি শহরে আট হাজার মুসলিমের মধ্যে বেঁচে থাকেন মাত্র আড়াই-শো জন। কিংবা কাঠুয়া নগরের আট হাজার মানুষের মধ্যে মৃত্যু এড়াতে পারেন মাত্র চল্লিশ জন মানুষ। অনেক পরিবারেই বাপ-ভাই-স্ত্রী-কন্যার সম্মান রাখতে নিজের হাতেই খুন করেন, তারপর আত্মসমর্পণ করেন ঘাতকদের হাতে। লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকায় এক 'বিশেষ প্রতিনিধি' লিখেছিলেন, 'সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে না থাকলে— দু-লাখ সাঁইত্রিশ হাজার মুসলিমকে ধাপে ধাপে উন্মূলিত করা হয়েছিল স্বয়ং মহারাজ দ্বারা পরিচালিত ডোগরা সৈন্য দ্বারা এবং হিন্দু ও শিখদের সহযোগিতায়। এবং এটা ঘটেছিল পাঠানরা কাশ্মীর আক্রমণের পাঁচদিন আগেই...' (১০.৮.৪৮)। ২২ অক্টোবর ('৪৭) ভোরবেলায় একদল পাঠান আদিবাসী কাশ্মীর আক্রমণ করে। আমাদের ইতিহাস বইতে পড়েছি ওই পাঠানবাহিনী পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। আক্রমণ থেকে বাঁচতে ২৫ অক্টোবর মহারাজা শ্রীনগর থেকে পালিয়ে জম্মুতে চলে যান। কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হওয়ার ফলে মহারাজ আরো হিংস্র হয়ে ওঠেন। জম্মুতে পৌঁছে নিজেই মেতে ওঠেন খুনের উৎসবে।

নভেম্বরের প্রথম দিকে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেয়া হল যারা পাকিস্তানে চলে যেতে চান তাঁরা যেন জম্মু থানায় জমায়েত হন, তাঁদের সরকার পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। হাজার হাজার মানুষ সেই নির্দেশ মেনে নিয়ে থানার শিবিরে ছুটে যান। ৬ নভেম্বর প্রায় এক-শো লরি-বাস ইত্যাদিতে চাপিয়ে মানুষ পাচার করার কাজ শুরু হয়। সশস্ত্র সেনাবাহিনী এসকর্ট করে নিয়ে যায় ওই কনভয়। বলা হয় নিয়ে যাওয়া হবে সীমান্ত শহর সুচেতগঢ়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয়া হবে পাকিস্তানে। কিন্তু কনভয় সুচেতগঢ়ে না গিয়ে চলে যায় সাম্বার জঙ্গলে। সেখানে অপেক্ষা করছিল অস্ত্রশিক্ষিত আরএসএস ঘাতকবাহিনী। ওই বাস-লরি ভর্তি মানুষগুলোকে নামিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুন করে তারা। অবশ্য খুনের আগে মহিলাদের ধর্ষণ করে সমস্ত গহনা কেড়ে নিতে জল্লাদেরা ভোলেনি। পরের দিন আরো বেশি লরিতে আরো বেশি মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়। আরো খুন, ধর্ষণ আর গহনার উল্লাসে মেতে ওঠে পিশাচের দল।

কত মানুষ খুন বা উদ্‌বাস্তু হয়েছিলেন? আড়াই লাখ, না পাঁচ লাখ? নাকি দশ লাখ? কোনো পরিসংখ্যান নেই— ১৯৪১-এর পর ১৯৫১-তে জম্মু-কাশ্মীরে জনগণনা হয়নি। ১৯৬১-র গণনার ছবিও স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র জম্মু জেলায়

১৯৪১-এ মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিলেন ৩৭ শতাংশ, ১৯৬১-তে সেটা নেমে যায় ১০ শতাংশ। তাহলে পুরো জম্মু অংশে বা জম্মু-কাশ্মীর মিলিয়ে মোট কত প্রাণের বিনাশ ঘটেছিল সে সংখ্যা কিন্তু কোনো দিনই জানা যাবে না। সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু ঘটনাগুলো নিয়ে নয়। অথচ আমাদের ইতিহাস বইতে সযত্নে ওই অধ্যায়টা বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে আমাদের পড়তে হচ্ছে অসম্পূর্ণ ইতিহাস। যে ইতিহাস পড়ে জম্মু-কাশ্মীরের সংকটের ঠিকঠাক মূল্যায়ন করা খুব মুশকিল। হয়তো কোনোদিন সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা হবে। হয়তো আমরা একদিন সত্যি জানতে পারব বৌদ্ধ-শৈব-ইসলামের ত্রিবেণী ধারায় পুষ্ট অতি প্রাচীন এক জনপদের কথা। যে জনপদের শাসকই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন প্রজাদের। হয়তো কোনোদিন জানতে পারব জম্মুর মাটি-পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া রক্তনদীর কথা। হয়তো জানা যাবে, ২৭ অক্টোবর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হবার পরেও জম্মুতে খুনের ধারা বজায় থাকার রহস্য! আর এই সবকিছু জানার আকুতি থাকলেই হয়তো জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার শিকড়ে পৌঁছোনো যাবে।

জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ ৬ নভেম্বর শহিদ দিবস পালন করেন। আরএসএস চাইছে হরি সিংহের জন্মদিন ২৩ সেপ্টেম্বর জম্মু-কাশ্মীরে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করতে। জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নে হরি সিংহের যে অবদান তারই স্বীকৃতিতে আরএসএস-এর ওই দাবি। জম্মু-কাশ্মীর আইনসভার উচ্চকক্ষে (বিধান পরিষদ) সে প্রস্তাব অনুমোদনও পেয়ে গেছিল। পরে জনরোষে সরকার ওই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আরএসএস ছাড়া হরি সিংহের সঠিক মূল্যায়ন কে করবে।

তথ্যসূত্র

১. *দ্য কাশ্মীর সাগা*, সরদার এম ইব্রাহিম খান
২. রঞ্জিত সিং'স, *কাশ্মীর এক্সটেন্সিজম্*, খাওয়াজা জাহিদ আজিজ
৩. *ডোগরা রাজ ইন কাশ্মীর*, এ জি নূরানি (ফ্রন্টলাইন: ৮.১১.১৭)
৪. *হোয়াট হ্যাপেন্ড টু মুসলিমস্ ইন জম্মু? : লোকাল আইডেনটিটি, 'ম্যাসাকার' অব ১৯৪৭' অ্যান্ড দ্য রুটস অব দ্য কাশ্মীর প্রবলেম*, ক্রিস্টোফার স্নেডেন
৫. *প্রিজুডিস ইন প্যারাডাইস*। অনুরাধা ভাসিন জামওয়াল
৬. *সিরকা ১৯৪৭ : এ লঙ স্টোরি*। খালিদ বসির আহমদ
৭. *দ্য ফরগটেন আপরাইজিং অব পুঞ্চ ১৯৪৭*। ক্রিস্টোফার স্নেডেন

জেএনইউ-র ছাত্রআন্দোলন থেকে বলছি

প্রতীম ঘোষাল

দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎ দেখা গেল যে এক দল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগারের সামনে প্রতিবাদ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হঠাৎই একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরির ভিতরে নিজেদের বইপত্র অথবা তার ফটোকপি নিয়ে ঢুকতে পারবে না। তার ঠিক কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেন যে, লাইব্রেরির বাজেটে বিশাল আকারের সংকোচন করা হচ্ছে। এই ছাত্রবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র সংসদের পদাধিকারীরা নিজেদের হাতে বই তুলে প্রতিবাদ জানায়। ক্যাম্পাসে প্রতিবাদের এক অভূতপূর্ব মাধ্যম আত্মপ্রকাশ করে। আমরা দেখি, ছাত্ররা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করার জন্য প্রতিবাদ করছে, স্লোগান দিচ্ছে হাতে বই নিয়ে। কারও হাতে আম্বেদকরের 'Annihilation of Caste' আবার কারও হাতে মার্কসের 'Das Capital'। কেউ কেউ আবার সাধারণ গল্পের বই অথবা খবরের কাগজ নিয়েও এসেছে তাদের প্রতিবাদ জানাতে।

লাইব্রেরির এই ঘটনাটি আসলে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিবাদের একটি দ্যোতক হিসেবে দেখা যেতে পারে। বিগত কিছু বছর ধরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত লড়াই চলেছে আরএসএস পরিচালিত প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। দেশের ক্ষমতায় থাকা ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার মতাদর্শগত এবং সাংগঠনিক মাথা, অর্থাৎ আরএসএস-এর মতে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির বিরোধী মতাদর্শ ধ্বংস করে দেওয়া খুবই জরুরি। ২০১৫ সালে আরএসএস-এর মুখপত্রে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় যেখানে বলা হয় যে, জেএনইউ দেশবিরোধী রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তার পর থেকেই শুরু হয় কিছু সংবাদমাধ্যম ও সরকারের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত জেএনইউ-বিরোধী লাগাতার কুৎসা ও অপপ্রচার। ২০১৬-র সেই কানহাইয়া-কাণ্ডের পর থেকে কিছু মিডিয়ার সাহায্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এক পরিকল্পিত আক্রমণ এসে পড়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং পঠনপাঠনের ব্যবস্থার উপর। গোটা দেশে এক প্রকারের বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মৌলিক আকার, তার ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যার শীর্ষে রয়েছেন উপাচার্য মামীডালা জগদীশ কুমার।

জেএনইউ স্থাপিত হয় ১৯৬৬ সালে ভারতের সংসদের একটি আইনের দ্বারা। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র ও শিক্ষকরা একটি নতুন কল্পনা নিয়ে পঠনপাঠন করতে থাকেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশ ও সমাজের নানান সমস্যার সমাধান খোঁজা। এবং দেশের সংবিধানের মূল উপাদানগুলি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় এবং যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর ভাবনাকে কার্যকর করা। স্থাপনা হওয়ার পর এই বিশ্ববিদ্যালয় বহু পথ অতিক্রম করে আজ দেশে এবং বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পিছনে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও পরিবেশে তিনটি উপাদানের মিশ্রণ। এই তিনটি বিশেষ উপাদান হল সমতা, স্বাধীন চিন্তাধারা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি। ২০১৬ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে যে বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে এই তিনটি আদর্শের উপর এক লাগাতার আক্রমণের রূপে দেখা যেতে পারে।

জেএনইউ-র স্থাপনা হওয়ার পর থেকেই শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায় সুযোগের সমতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমাজের সব শ্রেণির মানুষ, জাতপাত, ধর্ম, আয়, অঞ্চল ও লিঙ্গ নির্বিশেষে জেএনইউতে এসে পড়বে, দেশকে সমৃদ্ধ করবে এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রত। সত্তরের দশকে বহু বিবাদ ও সংগ্রামের ফলস্বরূপে উঠে আসে 'প্রোগ্রেসিভ অ্যাডমিশন পলিসি'। এই নীতি অনুযায়ী শুরু হয় 'ডেপ্রিভেশন পয়েন্টে'র পদ্ধতি। এই

পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু উপরি নম্বর প্রদান করা হয় দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জেলার প্রার্থীদের। তার সঙ্গে এই পয়েন্টটি দেওয়া হয় মহিলা এবং সমাজের বঞ্চিত সম্প্রদায় থেকে আসা প্রার্থীদের। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য একটি সমতল পরীক্ষা-ব্যবস্থা লাগু করা, যার দ্বারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত যে অসাম্য আছে সেটিকে হ্রাস করা। আশির দশকের মাঝে কিছু বছর এই অ্যাডমিশন নীতিকে বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু আবার নব্বই দশকের শুরুতে ছাত্র সংসদের সংগ্রামের ফলে চালু করা হয় এই প্রগতিশীল প্রবেশাধিকার নীতি। এই নীতির ফলে জেএনইউর ছাত্র-ছাত্রীদের মিশ্রণে পাওয়া যায় গোটা দেশের প্রতিফলন। ২০১৫-১৬-এ প্রবেশাধিকারের পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় যে জেএনইউতে গবেষণার জন্য ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪০ শতাংশ এমন পরিবার থেকে আসেন যাঁদের মাসিক পারিবারিক আয় ১২,০০০ টাকার থেকে কম, ৩৮ শতাংশের উপর ছাত্র-ছাত্রী গ্রামাঞ্চল থেকে এবং ৮৫ শতাংশের বেশি দেশের নানান রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে এসেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রগতিশীল অ্যাডমিশন পলিসির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ থেকেও বেশি। যেখানে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ লাগু করা হয় না, সেখানে জেএনইউতে তা সম্পূর্ণভাবে লাগু করা হয়।

এই তথ্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে গত তিন দশক ধরে যেখানে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার দ্রুত বেসরকারিকরণ চলেছে, সেখানে জেএনইউ-র মতো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রদান করতে পেরেছে দেশের বহুসংখ্যক দরিদ্র ও নিপীড়িত সম্প্রদায় থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমতা যে উৎকর্ষতা হ্রাস করে না বরং তা বাড়ায়, জেএনইউ-র অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই কথা বোঝা যায়। অনেকেই মনে করতে পারেন যে এই ডেপ্রিভেশন পয়েন্ট-এর জন্য মেধার ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু তা একেবারেই সঠিক নয়। বরং জেএনইউ-তে পড়া বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশে এবং বিদেশে সুনাম লাভ করেছেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই হল প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। এর সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে এই যে বৈচিত্র্য জেএনইউ-তে দেখা যায় তার এক বিশাল অবদান আছে সমালোচনামূলক শিক্ষার উদ্ভাবনে। সমাজের নানান স্তর থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের সংমিশ্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনী পঠনপাঠনের পদ্ধতিকে শক্তিশালী করেছে, বিতর্কের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে পাঠ্যক্রম।

সমতার সঙ্গে বৈচিত্র্য ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারার সংযোজনকেই ধ্বংস করতে চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বর্তমান সরকার। ২০১৬ সালে ইউজিসি-র একটি বিজ্ঞপ্তির অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা কমানো হয় ২০১৭-র প্রবেশিকা পরীক্ষায়। ৮৩ শতাংশ সিট ছেঁটে দেওয়া হয় এই বিজ্ঞপ্তির নামে। বেশিরভাগ বিভাগে গবেষণাক্ষেত্রে ভর্তি স্থগিত হয়। একাধিকবার ছাত্র-শিক্ষকের দ্বারা অথরিটির কাছে নিবেদন করা হয় যে এই বিজ্ঞপ্তিটি বেআইনিভাবে লাগু করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতেও অনড় থাকলেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া হল। নতুন যে প্রবেশিকা নীতি লাগু হল তাতে ডেপ্রিভেশন পয়েন্টের পদ্ধতিটিও অপসারিত করা হল। এই নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে শুরু করেন এক বিশাল আন্দোলন। টানা দু-বছর ধরে নানান কার্যক্রম করা হয়েছে, পথে হেঁটেছে শিক্ষক এবং ছাত্ররা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটেরও ডাক দেওয়া হয়েছে একাধিকবার। ৫০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী আবেদন জানিয়েছেন দেশের রাষ্ট্রপতিকেও। তবে কোনোদিকেই সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষে দিল্লির উচ্চ আদালতে মামলা করা হয় যেখানে প্রমাণ দেওয়া হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এবং দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে। গত দুই বছরের প্রবেশিকা তালিকার পরিসংখ্যান দেখিয়ে উচ্চ আদালতে বলা হয় যে ঠিক যে সমতার জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতি অর্জন করেছে, সেই সমতার ক্ষয় হয়েছে এই প্রশাসনের অ্যাডমিশন নীতির ফলে। দিল্লি হাই কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সমালোচনার সুরে রায় দিয়ে বলেন যে এই নীতির ফলে জাতীয় সম্পদের এক বিপুল অবক্ষয় হয়েছে গত দু-বছরে এবং সেই ক্ষতি পূরণ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে।

আজকে যখন কর্তৃপক্ষকে ভুল মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে তখন তাঁরা উলটো পথ নিয়ে আরেকটি সমতাবিরোধী ও ছাত্রবিরোধী নীতি লাগু করার চেষ্টা করছেন। অনলাইন পদ্ধতিতে আগামী বছরের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জেএনইউ প্রশাসন দৃঢ় প্রচেষ্টা করে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বব্যাপী চরিত্রটিকে যেকোনোভাবে বদলে ফেলার। যেরকমভাবে নানান ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলের পরীক্ষার জন্য অবজেকটিভ পরীক্ষা হয়, ঠিক একইভাবে সমাজবিজ্ঞান ও নানান ভাষার বিভাগগুলিতে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পাশ করতে হবে এই অনলাইন পরীক্ষা। সমাজবিজ্ঞান বা ভাষা নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক এক ছাত্রকে যাচাই করা হবে এমন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে যেখানে সেই প্রার্থীর ভিন্ন বিষয়ের উপর দখল ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাবে অবজেকটিভ 'মাল্টিপল চয়েস' প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে। স্বাধীনভাবে

চিন্তা করে প্রশ্নের জবাব দেওয়া অথবা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশ করেছে এতদিন, সেটিকে আটকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। এই নতুন অ্যাডমিশন নীতির আসল লক্ষ্য হল গোটা প্রবেশিকা প্রক্রিয়াটির উপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি। বর্তমান প্রবেশিকা নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজস্ব প্রশ্নপত্র তৈরি করেন যেটির মাধ্যমে ছাত্ররা নানান বিষয়ের উপর দখল ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে প্রবেশাধিকার অর্জন করে। কিন্তু আজ সেটিকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর সঙ্গে এও উল্লেখ করা অনিবার্য যে, জেএনইউ-তে যেহেতু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়, তাই নিজের মাতৃভাষাতে পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু অনলাইন পরীক্ষা হয়ে গেলে এই যে বিশেষ অধিকার পাওয়া যায়, সেটিকেও ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

জার্মানির প্রখ্যাত মার্কসবাদী কবি বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'The Solution Poem' (1959)-এ লিখেছিলেন যে,

> 'Would it not be easier
> In that case for the Government
> To dissolve the people
> And elect another?'

জেএনইউ-র বর্তান কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম দেখলে ঠিক এমন মনে হবে। তার কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অধিকতর ছাত্র-ছাত্রী লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে এই ছাত্রবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে। তার জন্যই হয়তো প্রশাসন এমনকিছু পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই ছাত্রদেরই বদলে দেওয়া যায়! গত ২ বছরে এক অবিশ্বাস্য ও ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। কম করে ১৫টি পুলিশ কেস করা হয়েছে ৫০-এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর, এবং নানান প্রতিবাদ জানানোর ফলে শাস্তি হিসেবে ছাত্রদের থেকে ফাইন সংগ্রহ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার। একটি আরটিআই-এর জবাবে জানা গিয়েছে যে ২০১৭ সালে মোট ফাইনের অর্থ ছিল ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা যেগুলি আদায় করা হয়েছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে। চিরকাল যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি মডেল হিসেবে প্রখ্যাত, যেখানে তীব্র রাজনৈতিক আলাপচর্চা ও বিবাদ চলত একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের আঙিনায়, আজ সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশটিকে দূষিত করা হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ন্যায্য দাবির জন্য আওয়াজ না তোলে। লাগু করার চেষ্টা হয়েছে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির নিয়ম আবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত বা প্রতিবাদ করার অধিকার। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর যে লিখিত বিধি রয়েছে সেগুলিকে লাগাতার অবজ্ঞা করা হচ্ছে, ছাত্রদের সেই প্রক্রিয়া থেকে বাদ রেখে একের পর এক নীতি লাগু করেছে বর্তমান প্রশাসন।

কিন্তু অবিরাম আক্রমণ সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরা হার মানেনি। শামিল হয়েছেন লং মার্চে, লাগাতার চালাচ্ছেন প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন। দফায় দফায় প্রতিবাদ, মিছিল ও জমায়েত হয়েছে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, যেখানে দেশের তথা বিদেশের নানান রাজনৈতিক বিষয়ের উপর অবস্থান গ্রহণ করে এখানকার ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির চার দেওয়ালের বাইরেও অংশগ্রহণ করেছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনে। আদর্শ ও ঐক্যের শক্তি দিয়ে একটি দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি প্রধান উপাদান, সমতা, স্বাধীন চিন্তাধারা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করার। গোটা দেশের প্রগতিশীল মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত উদাহরণ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে জেএনইউ-র চারটি প্রধান বাম ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন। সংকীর্ণতা ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে পাশে সরিয়ে রেখে একসঙ্গে আন্দোলন সংগঠিত করেছে তারা, ছাত্রসংঘের নির্বাচনে যৌথভাবে লড়ে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-কে পরাস্ত করেছে। এতে উঠে এসেছে এক চমৎকার ছাত্র-ঐক্য যেটি আজকের প্রশাসনকে পরাজিত করার জন্য অতি মূল্যবান।

এইটুকু বলে শেষ করব যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে পরিচালিত হয় ও সেখানে যা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও আন্দোলন হয়, তা একটি দেশ ও সমাজের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যেতে পারে। আজ একদিকে লাইব্রেরির বাজেট ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে, তো অন্যদিকে নিরাপত্তার উপর খরচ বাড়ানো হচ্ছে ৭ গুণ, যা লাইব্রেরির বাজেটের থেকেও বেশি! এই পরিস্থিতি আসলে আমাদের বর্তমান সরকার ও কর্তৃপক্ষের এক স্বৈরাচারীও পড়াশোনাবিরোধী মানসিকতার প্রতীক। তবে যেমনভাবে আজ কৃষক, মজদুর, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ও গণতন্ত্রপ্রিয় অধিকার-প্রেমী মানুষ রাজপথে নামছেন ঠিক তেমনভাবেই দেশের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংগ্রাম করে চলেছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যখন শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা সবার অধিকার হয়ে উঠবে ও এই স্বৈরাচারী শাসন পরাস্ত হবে। জেএনইউ-তে চলা ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামটি সেই বৃহৎ লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইতিহাসের বাজারদর: চাহিদা ও জোগান

সৌরদীপ চট্টোপাধ্যায়

বাসে যখন দু-খানা করে গেট থাকত, তখন পিছনের গেটের কনডাক্টর সামনের গেটে জানান দিতে হাত দিয়ে চাপড়ে শব্দ করত। কেননা দড়ি বাঁধা ঘন্টি একমাত্র সামনের গেটেই থাকত। এইবার এই হাত চাপড়ানো হাত এবং বাসের গা, দুজনের পক্ষেই যন্ত্রণার। ফলে কনডাক্টর সচরাচর যা করত, কেউ হয়তো ভাড়া কাটছে, সেই নিকেলের কয়েন দিয়েই টং টকাস করে ঘন্টি দিয়ে দিত। পয়সার এহেন ব্যবহার জানলে মা লক্ষ্মী কী করতেন সেটা পুরাণবিদরা বলতে পারবেন। কিন্তু যা হোক, সব জিনিসেরই এইভাবে একাধিক ব্যবহার থাকে। তপন রায়চৌধুরী লিখেছিলেন, তাঁর ভারী ভারী গবেষণার বই তো কেউ কিনল না, একদা দেখেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর শিশুপুত্র সেটি বাজিয়ে পরমানন্দে তবলাচর্চা করছে। এই দেখে তিনি ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তো এই জাতীয় জিনিসপত্রের মধ্যে সবচেয়ে দামি এবং শক্তিশালী 'আইটেম' বোধ করি 'ইতিহাস'। ইতিহাসের নানাবিধ ব্যবহারে ইতিহাস থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যৎ অবধি সবই আনন্দিত ও জর্জরিত। এই ব্যবহার এমনই সফল যে রীতিমতো বাজার তৈরি হয় ইতিহাসের এবং চাহিদামতো সাপ্লাই দিতে দিতে নাজেহাল হতে হয় কানে-পেনসিল পণ্ডিতদের। বাজারের চাহিদার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ইতিহাসের দাম কমে বা বাড়ে! লুই নেপোলিয়নের আঠারোতম মাসের খ্যাতনামা 'ক্যু'-এর বিবরণ দিতে গিয়ে মার্কস হেগেলের কথা লিখেছিলেন, ইতিহাস নিজেকে অন্তত দুই বার আবর্তিত করে। কিন্তু হেগেল যেটা লেখেননি, একবার ট্রাজেডি হিসেবে, পরের বার প্রহসন হিসেবে। এই প্রসঙ্গে তিনি রোমসপিয়েরের 'ফিরে আসা' বলতে লুই ব্লাঁকে বুঝিয়েছিলেন। মার্কস যখন মারা যান তখন হিটলার জন্মাননি এবং তাঁর বাবার পদবি 'হিটলার' হয়নি। স্তালিনের বয়স তখন সবে সাত। ফলে লুই ব্লাঁয়ের থেকে ভালো উদাহরণ তাঁর হাতে ছিল না। কিন্তু অন্তত এই মাপকাঠিতেও, জিউসের জায়গায় যিশুকে বসালে এবং পেরিক্লিসের জায়গায় রানি ভিক্টোরিয়াকে বসালে গুণীজনদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। হেরোডটাসের আধুনিক সংস্করণ এডোয়ার্ড গিবন কিনা সেটাও তর্কের বিষয়। কিন্তু তার পরেও, ইংল্যান্ডে একটা সময়, যখন মার্কস হ্যাম্পস্টেডে বসে লেখালিখি করছেন, ওই তার আগে-পরেই, সাহেবদের মনে হতে থাকে যে টেমসের ধারেই অলিম্পাস পাহাড় চেগে উঠেছে এবং প্রাচীন সোনার গ্রিসের খাঁটি উত্তরসূরি যদি কেউ হতে পারে, তো তবে সেটা তাঁরাই।

বলাই বাহুল্য, এর পেছনে মার্কসের হাত ছিল না, মার্কসের আসরে নামার অনেক আগে থেকেই ব্রিটিশ সমাজে এহেন ভাবনা গজিয়ে ওঠে। কেন ওঠে— তার একটা বড়ো কারণ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার আবেদন ও আজও বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। অতএব গ্রিস-রোমের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাসকে 'রোল মডেল' ঠাওরানোতে নতুন কিছু নেই। শেক্সপিয়র থেকে বেকন— এমনকী হালের হলিউড অবধি এই আবেদন ঠেকাতে পারেনি। সাম্রাজ্যের আসরে ব্রিটেন অবিশ্যি নতুন খেলোয়াড়। এককালে তাদের সূর্য ডুবত না বলে কথা থাকলেও সেই জায়গাটা কিন্তু সতেরো শতকের আগেও তেমন বড়োসড়ো ছিল না। অন্তত স্পেনীয় বা পর্তুগিজ বা ওলন্দাজদের তুলনায় নয়ই। বরং ব্রিটেনের খেলা শুরুই হয় পূর্বোক্তদের এলাকায় ভাগ বসানো দিয়ে। শেষে আসে ফরাসিরা। আঠারো শতক পুরোটাই ফরাসি ও ইংরেজের দ্বৈরথের কাহিনি। বলাই বাহুল্য, বেশিরভাগ মাঠেই ইংরেজরা জিতেছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তো বিলিতি শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয়। এই ঘটনার শুরু ১৭৬৩-র প্যারিসের চুক্তির পরেই। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ের ফলে মোটামুটি ব্রিটিশের মানদণ্ড রাজদণ্ডকে অবধি বাটখারায় বসিয়ে মেপে নেওয়ার জায়গায় চলে যায়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে দেখা দেয় শিল্পবিপ্লব। বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং বিজিত 'কলোনি' থেকে আসা কাঁচামালে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানাগুলি কার্যত ব্রিটেনে সোনার যুগ নিয়ে আসে।

ইংল্যান্ডের এইরকম দিনেই লন্ডনে গ্রিক-রোমান ইতিহাসের চাহিদা চড়চড় করে বাড়তে থাকে। এর পিছনে আরো একটা

কারণ ইংরেজদের মাথায় বরাবর বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ। মোটামুটি স্পেনসারের 'ফেয়ারি ক্যুইন'-এর পর থেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে কখনো পিছনে তাকাতে হয়নি, শেক্সপিয়র থেকে মিল্টন, স্কট, বার্নস, হার্ডি, বায়রন থেকে পোপ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ-কিটস বা ডিকেন্স— ইংরেজি সাহিত্যে বরাবর নক্ষত্রের ছড়াছড়ি। সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনচর্চায় সাহেবরা আজও পৃথিবীতে অন্যতম অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হন। অতএব রাজবাড়ির সস্নেহ প্রশ্রয়ে, আর্থিক সচ্ছলতায়, বিভিন্ন অভিযান ও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রেক্ষিতে এবং জানার স্বাভাবিক ঝোঁকে লন্ডনে প্রাচীন দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, মহাকাব্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্যচর্চা বেড়ে যায়।

গ্রিক সভ্যতার এহেন আবেদনের কারণ লুকিয়ে ছিল তাদের ধরনে। গ্রিক সভ্যতা, হাজার হোক, বীরপূজারি। ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মতো সাহিত্যের 'ক্লাসিক' ধারাটির উদ্ভাবক। যুদ্ধবিদ্যায় দুর্ধর্ষ। সমাজে পৌরুষের আবেদন ঈর্ষণীয়। এই পৌরুষের আবেদন বোঝা যায় গ্রিক দেব-দেবী ও নায়কের মূর্তিতে। পেশিবহুল চেহারা, ব্যক্তিত্ব, বীরত্বে 'গ্রিক নায়ক' শব্দটি আজও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় উপমা বা রূপক হিসেবে চলে। বলাই বাহুল্য, মানুষের সুকৃতি ও সৃজনশীলতার প্রতিটি স্তরেই সর্বপ্রথম এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ('ক্লাসিক' শব্দটি লক্ষণীয়) স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে। অতএব জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ও সারস্বত সাধনাতে গ্রিক ক্লাসিকের ধীরোদাত্ত, দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, প্রাঞ্জল, কাব্যময় এবং অতি অবশ্যই রোমান্টিক উপস্থাপনা বিলিতি লেখক ও পাঠকের হৃদয় টালমাটাল করে তোলে। ইংরেজদের উত্তরাধিকার হিসেবে আমরাও ডগমগ করে সেসব গ্রহণ করেছি। সময়টা খেয়ালে রাখার মতো। আঠারো থেকে উনিশ শতক। জন কিটসের ওড এবং কোলরিজের কাব্য তখনই প্রকাশিত হচ্ছে। রোমান্টিকতার এহেন উর্বর ভূমি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, যখন তার আগের পর্যায়ে এক দল ইংরেজ কবি-শিল্পীরা লাতিন ও রোমান ক্লাসিকের স্বাদে মোহিত হয়ে অমন ক্লাসিক লিখবেন বলে ঠিক করেন। আমরা ক্লাসিকের অনুসরণে তাঁদের নাম দিয়েছি 'নিওক্লাসিক'। গ্রিক সাহিত্য, গ্রিক দর্শন, গ্রিক বিজ্ঞান ও তর্কচর্চা ক্রমশই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই সময়েই প্রকাশিত হয় এডোয়ার্ড গিবনের প্রাতঃস্মরণীয় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস। পতনের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার, ব্যাপ্তি এবং কার্থেজ অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনি সাড়া ফেলে দেয় সাহেবদের মনে। স্বাভাবিক, তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনা টানতে গেলে এই একটি উদাহরণই সম্ভবত সামনে আসবে। আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের সমাজ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্নে বিভোর। ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা দখল করছেন লাতিন আমেরিকা থেকে এশিয়া, ইংরেজের সূর্যাস্ত ঘটে না। ভিক্টোরিয়ান যুগে এল সামাজিক ভেদাভেদ এবং তথাকথিত 'এলিট'-শ্রেণির রমরমা। নীতিবোধ নিয়ে চরম নাক সিটকোনো ইংরেজ তখন হাতিয়ার বানিয়ে ফেলল গ্রিক ঐতিহ্যকে। শেক্সপিয়রের নাট্যসমূহ থাকতেও হঠাৎ করে লন্ডনে সফোক্লিস-ইউরিপিডিস ও প্লেটো-অ্যারিস্টটলের বাজারদর বেড়ে গেল। শেক্সপিয়রের নাটকেও অবশ্য কোনোকালে মন্দা দেখা যায়নি। নাটকের বিষয়গুলো খেয়াল করার মতো। জুলিয়াস সিজার, অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রা, কোরিওলিনাস, মিডসামার-নাইটস ড্রিম, ট্রয়লাস-ক্রেসিডা— এমনকী বেশিরভাগ কমেডি ও ট্রাজেডিরই পটভূমি রোমান ও গ্রিক সাম্রাজ্য।

প্রাচীন গ্রিস ও রোম সম্পর্কে এহেন মুগ্ধতা গোটা পৃথিবীতেই রয়েছে, আজও রয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের যুগবিভাগ মোটামুটি তিনটে যুগের কথা বলে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-৮০০ অব্দকে বলে হিরোয়িক এজ— নায়কের যুগ। মেনেলোস, অ্যাকিলিস, হেক্টর, হেরাক্লিস, পার্সিউস, ওডিসিউসের গাথা আজও পৃথিবীর রূপকথায় ছড়িয়ে আছে। হোমারের ট্রয় যুদ্ধ এইসময়েই হয়েছিল বলে অনুমান। পরবর্তী ৮০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে বলে 'আর্কাইক এজ'। এই হল ইতিহাসে পড়া এথেন্স-স্পার্টার দ্বন্দ্বের যুগ, পোলিসের যুগ, অলিম্পিকের যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ অব্দ হল প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকময়তার যুগ, ক্লাসিক এজ। পেরিক্লিস-সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল-সফোক্লিস-ইউরিপিডিস-অ্যাস্কিলাসসহ বিখ্যাত গ্রিক মহাপুরুষদের যুগ। এডগার অ্যালান পো যাকে বলেছিলেন, 'দ্য গ্লোরি দ্যাট ওয়াজ গ্রিস!' এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থের রাজত্ব বেড়েছিল সিসিলি থেকে এশিয়া মাইনর অবধি। জিউস-অ্যাপোলো-এথেনা-অ্যাফ্রোডাইট-পসেইডন-আর্টেমিসসহ দেবতাদের গল্প ছড়িয়েছে এশিয়া থেকে ইউরোপে। তার পরের গল্প হল আলেকজান্ডারের, গ্রিসকে শেষবারের মতো একতাবদ্ধ করার। কালের নিয়মে সেই গ্রিক গৌরবের সূর্যাস্ত ঘটে পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তিতে।

ঘটনা হচ্ছে, দু-শো বছর আগে লন্ডনের ইংরেজ হোমরাচোমরাদেরও গ্রিস-প্রেমের গল্পের পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অনেকটা হাত রয়েছে। তখন প্রত্নতত্ত্বচর্চার স্বর্ণযুগ। তুরস্কের অটোমাস সুলতানের কাছে ব্রিটিশদের রাষ্ট্রদূত তখন লর্ড এলগিন। সাহেবের আসল নাম টমাস ব্রুস, এলগিন (আর্ল) উপাধি। এই সাহেবের এগারোটি সন্তানের অন্যতম জেমস ব্রুস পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বড়োলাট হয়েছিলেন, যাঁর নামে কলকাতার এলগিন রোড। এই টমাস ব্রুস ছিলেন কীর্তিমান লোক। তুরস্ক থেকে নিজের উদ্যোগে তিনি গ্রিসে যান এবং

নিজের উদ্যোগেই এথেন্সের বিশ্ববিখ্যাত অ্যাক্রোপলিসের পার্থেনন মন্দিরটিতে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেন। আজও বহু মানুষকে মুগ্ধ করা পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যটিতে এলগিন সাহেবের উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল মহৎ! তিনি সেখান থেকে দেদার শ্বেতপাথরের ভাস্কর্য বেআইনিভাবে উপড়ে নিয়ে সটান লন্ডন নিয়ে আসেন। মুখে বলেন, তুরস্ক হঠাৎ করে গ্রিস আক্রমণ করলে সেগুলি যাতে নষ্ট না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। এই যুক্তি গত দু-শো বছরে সাহেবরা অজস্র বার দিয়েছে। চৌর্যবৃত্তি যে উপযুক্ত প্রতিভার হাতে পড়লে টহৎ মানবপ্রেমে বদলে যেতে পারে, এই উদাহরণ আমরা পরেও দেখেছি। এলগিনের আসল উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সেসব বেচে দু-পয়সা কামিয়ে নেওয়া। কাজ হাসিলও হয়। যদিও সেকালে নিন্দাও হয়েছিল, স্বয়ং কবি বায়রন এলগিনকে চোর বলতে ছাড়েননি। তবু, আইন-টাইন করে প্রাচীন স্থপতি ফিডিয়াসের তৈরি সেই বিপুল পরিমাণ ভাস্কর্য শেষে ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই স্থান পায়, এখনও সেখানকার দুভিন গ্যালারিতেই আছে। যদিও গ্রিসে সেসব ফেরানোর ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে, খোদ ইউনেস্কো অবধি হস্তক্ষেপ করেছে।

যা হোক। সেই শুরু। তারপর এক জার্মান কোটিপতি হাইনরিখ শ্লিমান কিংবদন্তির ট্রয় যুদ্ধের ব্যাপারে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেন। প্রায় দশ বছর ধরে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় খননকার্যের পর তিনি রহস্যময়, পৌরাণিক ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। প্রায় সাতটি স্তর বের করেছিলেন তিনি, তার চতুর্থ স্তরে পাওয়া যায় এক বিশাল সোনার বাসনপত্র ও অলংকারের ভাণ্ডার— যার নাম 'প্রিয়মের সোনা'। হাইনরিখও যথারীতি তুরস্ক ও গ্রিস সরকারকে পাশ কাটিয়ে সেসব বার্লিনের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন রেড আর্মির আওতায় এলে রুশরা সেসব নিয়ে দেশে পাড়ি দেয়, আপাতত এই ভাণ্ডারটির ঠিকানা মস্কোর পুশকিন মিউজিয়াম। তারপর এক ব্রিটিশ অধ্যাপক, স্যার আর্থার ইভানস ক্রিট দ্বীপে খননকার্য চালিয়ে রাজা মিনোর ঐতিহাসিক প্রাসাদটির ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বের করেন। কথিত আছে, খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের এক ভয়াল ভূমিকম্পে প্রাসাদটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে গিয়েছিল।

মুশকিল হল তারপর।

'দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড ফ্রম দ্য অ্যাকসেশন অফ জেমস দ্য সেকেন্ড' বইয়ের ভূমিকাতে লর্ড মেকলে লিখেছিলেন, 'আমরা, ব্রিটিশরা স্বভাবগতভাবে কোমল ও দয়ালু। অন্তত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেই চলেছি। যতই আমরা পুরোনোকে ঘেঁটে দেখি, ততই আমাদের দুঃখিত হতে হবে কেননা বর্তমানে আমরা ক্ষমাসুন্দর সময়ে বসবাস করছি!' এই মেকলেই আসলে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, যিনি ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ককে বলেছিলেন অবিলম্বে ভারতবাসীকে সভ্য করার জন্য পশ্চিমি 'ইউটিলিটারিয়ান' শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার এবং যা নিয়ে তৎকালীন পটলডাঙা থেকে লালদিঘি অবধি আলোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মেকলের বইটি বেরোয় ওই ১৮৪৮ নাগাদই। এই সময়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মেকলের এহেন দাবির ইতিহাস। সময়টা ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার। নীতি এমনই জাঁকিয়ে বসেছে যে জুডিথ ওয়াকোইৎজ বলেছিলেন 'মরাল প্যানিক' (Walkowitz, *City of Dreadful Delight,* 1992: University of Chicago Press)। মেকলে ভুল বলেননি, এইসময় অন্তত সাহেবরা নিজেদের উদারতম ও দয়ার সাগর ভেবেই আনন্দ পেত। ফলে উলটোটাও ঘটল, হিংসা দেখলেই লজ্জাবতীর পাতার মতো সিঁটিয়ে যাওয়া। এইবার এই হিংসার তালিকাটা লম্বা হতে শুরু করল নীতির চাপে। প্রথমেই, মানবসভ্যতার চিরকেলে নিয়মে— ঢুকে গেল যৌনতা। নরমান আক্রমণের ইতিহাস ভুলে যৌনতার কথা শুনলেই সাহেবদের জিভ কাটা ও কানে আঙুল দেওয়ার দিন শুরু হল। পাশাপাশি শিশুশ্রম নিবারণ, পশুপ্রেম, মদ্যপান নিবারণীদের দাপটে লন্ডনের সমাজ অচিরেই জ্যাঠামোতে ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে ফেলল। এবার এই ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার উলটোদিকটা কেমন ছিল, তা বুঝতে বেশি দূর যেতে হবে না, ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের কথা ভাবলেই চলবে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার লাটসাহেবরা মহান হৃদয় মানবপ্রেমিক দয়ার সাগর ছিলেন, একথা শুনলে হুইগ ইতিহাসবিদরাও লজ্জা পাবেন। মধুসূদন মাইকেল না হলে এবং খাঁটি বিলিতি কায়দায় ইংরেজি না বললে রিচার্ডসন সাহেব কতটা সদয় হতেন— সেই নিয়ে সন্দেহ থাকে। কিন্তু বিলেতের অবস্থাও কিছু আলাদা ছিল না। একদিকে সমাজ ও নীতি ভাঙার নামে শাস্তি, অন্যদিকে আদিরস, গোপনে দেহব্যাবসা, শিশুশ্রম, শিশুকাম, মদ্য ও নেশাদ্রব্যের বিক্রয় সবেতেই উপরের নীতির পর্দার আড়ালে লন্ডনের হাই স্ট্রিট দিব্যি ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বলা চলে লন্ডনে ১৮৮৫ সালের কুখ্যাত এলিজা আর্মস্ট্রং কাণ্ড। আজকের 'ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম'-এর প্রবক্তা উইলিয়াম টমাস স্টেড এক রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালিয়ে নিজের কাগজ 'পল মল গেজেটে' লেখেন এক গোপন চক্রের কথা, যারা অল্প পাউন্ডের বিনিময়ে বিভিন্ন দেহব্যাবসার আখড়ায় 'ভার্জিন' মেয়ে সাপ্লাই করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক! সারা ব্রিটেন তোলপাড় হয়ে যায়, স্টেডের কাগজের বিক্রি এমনই বেড়ে যায় যে— একসময় ছাপার জন্য কাগজের কাঁচামাল আর থাকে না। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন তৎকালীন বহু বিশিষ্টজন, এমনকী খোদ জর্জ বার্নার্ড শ' অবধি নাকি টেলিগ্রাম

পাঠান। শোনা যায়, এই কাণ্ডের প্রেক্ষিতেই নাকি বার্নার্ড শ'-এর বিখ্যাত 'পিগম্যালিয়ন' নাটকের জন্ম, যার মুখ্য চরিত্রের নাম এলিজা। স্টেডের লেখার জনপ্রিয়তা, ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া এবং পার্লামেন্টে অবধি তুমুল নাটকীয় তর্কাতর্কি থেকে অন্তত আন্দাজ করা যায়, ঠিক কতটা নৈতিক টানা-পোড়েনে ছিল ব্রিটিশরা। বাস্তবের সঙ্গে তাদের কাঙ্ক্ষিত সত্তার সংঘর্ষে কতটা নাড়া খেয়েছিল তাদের জীবন। সেইসময় ইংল্যান্ডের পরিস্থিতিতে যৌনতার চেয়েও বেশি ছিল নৈতিকতা, সংযম ও পৌরুষের ধারণা। ব্যাপারটা সেই আঠারো শতকের কলকাতার বাবুসংস্কৃতির মতোই ছিল। ফারাক এটাই যে, দিশি বাঙালিবাবুরা বৈষ্ণবের ছয় রসের তুলনায় আদিরসকে মাথায় তুলে কবিগান ও খেউড়ের আসরে মজেছিলেন। সুসভ্য ব্রিটিশ জাত সেখানে ভিক্টোরীয় রোমান্টিকতার ঠেলায় চরম গ্রিক নীতিবোধ ও পৌরুষত্বের শিখরে চাপতে চেয়েছিল। তখন গৃহযুদ্ধের পরে রাজদণ্ডের বিপরীতে পার্লামেন্টের ছড়ি মজবুত হয়েছে, অলিভার ক্রমওয়েল নায়ক হয়েছেন, গৌরবময় বিপ্লবের পর স্টুয়ার্টরা ক্ষমতায় এসেছেন, শিল্পবিপ্লবে ব্রিটিশ কারখানা বিশ্ববাজারের সমতুল্য হয়েছে। এইসময় শিল্পপতি ও অভিজাত ইংরেজ বাবুদের ঠাটবাটই আলাদা। কিন্তু আদিরসের সাপ্লাই অনিয়ন্ত্রিত, কবিগানের আসরেও সমস্যা হয়নি। সমস্যা হল ব্রিটিশ বাবুদের। কেননা, গ্রিক ইতিহাসকে তাঁরা যেমন ভেবেছিলেন, আদতে সেটা তার চেয়েও অনেক— অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, বিলিতি ভিক্টোরীয় আদবকায়দার পক্ষে সেসব রীতিমতো মারাত্মক!

ইতিহাসবিদ নরম্যান ক্যান্টর শোনাচ্ছেন বিখ্যাত ব্রিটিশ অধ্যাপক বেঞ্জামিন জোয়েটের কথা। উনিশ শতকের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসাইটে অধ্যাপক ও গ্রিক শিক্ষক জোয়েট ছিলেন বেলিওল কলেজের 'মাস্টার' (বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষব্যক্তি), প্লেটো ও সক্রেটিসের রচনার অন্যতম নামজাদা অনুবাদক। সেই জোয়েট বসেছেন প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম' অনুবাদ করতে। খ্রিস্টের জন্মের আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর আগে লেখা প্লেটোর এই বিখ্যাত রচনাটি আদতে এক সভাকক্ষে সমবেত কিছু অভিজাত পুরুষের আলাপ, তাদের মধ্যে রয়েছেন খোদ সক্রেটিস ও অ্যারিস্টোফিনিস। এদিকে সেই টেক্সটের ছত্রে ছত্রে রয়েছে সমকামিতা ও শিশুকাম। কী করে সেসব লিখবেন জোয়েট? তিনি সটান সেসব বাদ দিয়ে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিলেন। কাজটা মেজো-সেজো গোত্রের অনুবাদক হলে 'প্রক্ষেপ' নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক এমনটা করলে একটু ভাবতে হয় বই-কী!

এই বেঞ্জামিন জোয়েট সেকালের অন্যতম প্রভাবশালী পণ্ডিত। সেইসময় ব্রিটিশের এই গ্রিক উত্তরাধিকারের তত্ত্ব করতে বার বারই সমসাময়িকরা দ্বারস্থ হতেন জোয়েটের (Richard Dellamora, *Masculine Desire: The Sexual Politics of Victorian Aestheticism,* 1990: University of North Carolina Press)। জোয়েটের আরেকটি কীর্তি, তিনি বিখ্যাত সিভিল সার্ভিসের পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের কাঠামো নির্দেশ করেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম, কীভাবে পাশ্চাত্যের আলো পৌঁছে দেওয়া যায় বিজিতদের মধ্যে। যেভাবে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব পড়েছিল সেই প্রাচীন যুগে বসফরাসের ওপারেও। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে যাতে প্রাচ্যের ছাত্ররাও পড়তে আসতে পারে, সেই ব্যাপারে জোয়েটের অক্লান্ত চেষ্টা ছিল, মূলত তাঁর স্নেহ ও ছত্রছায়াতেই অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজ থেকে পাশ করেন ভারতের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার এবং বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কর্নেলিয়া সোরাবজি। কিন্তু ততদিনে অভিযোগও জমতে শুরু করেছে। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের ছাত্ররা প্রায়ই অভিযোগ করত এতে নাকি তাদের পরিবেশ 'দূষিত' হচ্ছে, 'ভিন বর্ণের' (পড়তে হবে, কালাদের) আক্রমণ ঘটছে। আজ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে যাওয়া সব হারানো শরণার্থীদের দেখে প্রায়ই ইউরোপের রাজনীতিকরা অভিযোগ করেন, তাঁদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের জমি শক্ত হচ্ছে। তখন সন্ত্রাসবাদ ছিল না। অভিযোগের অন্তও ছিল না।

জোয়েটের আপত্তি থাকলেও, গ্রিস দেশের ইতিহাস, বিশেষ করে সেই স্বর্ণযুগের প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস আসলেই এক নগ্ন প্রবৃত্তির ইতিহাস। গ্রিকরা নিজেদের জীবনের বাসনা চরিতার্থের ব্যাপারে কাউকেই পরোয়া করত না। তাদের স্বভাবও ছিল অত্যন্ত উগ্র। এই উগ্রতার সূত্রপাত হয়তো তাদের জিনগত অথবা কঠিন পাহাড়ি জীবনযাত্রায় অর্জিত। তবু, গ্রিক সমাজে রক্তপাতটা তেমন গুরুত্বই পেত না। তার উপর রয়েছে অসত্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা। ক্যান্টর লিখছেন, বেশিরভাগ গ্রিক সম্ভ্রান্ত নাগরিকরাই ছিলেন আদতে শিশুকামী ও শিশুনির্যাতক। এইসব দেখেই আসরে নামেন কুখ্যাত গ্রিকপণ্ডিত ড্রাকো। এই নামটি অধুনা হ্যারি পটার সিরিজের ভিলেনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। মানুষ হিসেবে গ্রিকপণ্ডিত অবশ্য আদৌ অমন কুটিল ছিলেন না। ছিল তাঁর প্রণীত আইনগুলি। সামান্য চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, টাকা ধার নিয়ে শোধ না দিলে ড্রাকোর নিদান ছিল ঋণগ্রহীতা চিরকাল দাতার ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। এই আইনের এমনই মহিমা যে, আজও কোনো কঠোর বা নির্মম আইনকে ইংরেজিতে 'ড্রাকোনিয়ান' বলা হয়। মজার কথা, ড্রাকো নিজে ছিলেন ভয়ানক জনপ্রিয়! শোনা যায়, ড্রাকোকে নাকি এথেন্সের জনগণই অনুরোধ করেন এইসব আইনকানুন

লিখে দিতে। এই জনপ্রিয়তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় ড্রাকোর মৃত্যুর ঘটনায়! প্লুতার্ক লিখছেন, এথেন্সের এক নাট্যালয়ে এক সন্ধ্যায় হাজির হয়েছেন ড্রাকো। জমায়েত নাগরিকরা তাতে এতই আপ্লুত হয়ে পড়েন যে আবেগে সম্মান জানাতে গিয়ে নিজেদের পোশাক ও টুপি খুলে ড্রাকোর দিকে ছুড়তে থাকেন। এই ঘটনা আজও দেখা যায়, বিশেষ করে খেলার মাঠে। কোনো খেলোয়াড় দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে মাঠের ধারে গেলে গ্যালারি থেকে স্কার্ফ, টুপি ইত্যাদি উড়ে যেতে থাকে। বৃদ্ধ ড্রাকো অত পোশাকের চাপ নিতে না পেরে দমবন্ধ হয়ে মারা যান!

এই ঘটনা ৬২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। তাতেও মাত্রাতিরিক্ত অসিচালনা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এমন খুনোখুনি বন্ধ হল না। পরবর্তী আইনপ্রণেতা সোলোন ড্রাকোর অনেকগুলি আইন বাতিল করলেও হোমিসাইড সংক্রান্ত নিদান কিন্তু বলবৎ রেখেছিলেন। বলাই বাহুল্য, আশি ভাগ অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড!

আর যে ব্যাপারে এলগিন বা শ্লিমানরা ইতস্তত করে চেপে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল দাসপ্রথা। ক্রীতদাসদের ব্যাপারে রোমানদেরই এগিয়ে রাখা হয়। কিন্তু কেম্ব্রিজ ইতিহাসবিদ রবিন অসবোর্ন লিখছেন, আর্কাইক যুগের এথেন্স শহরের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল ক্রীতদাস। তাদের সমস্ত রকম কড়া কায়িক পরিশ্রমের কাজে লাগানো হত, নিদারুণ অত্যাচার চলত এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধে কিছুই ছিল না। আজকের দিনে যতই বিতর্ক হোক, প্রাচীন গ্রিক রাজপুরুষ ও অভিজাতরা অনেকে বেশ খোলামেলাভাবেই সমকামী হতেন, কেউ কেউ বাইসেক্সুয়ালও হতেন। একইসঙ্গে বালক ও বেশ্যা উভয়েরই সান্নিধ্যলাভ চলত। সবচেয়ে বড়ো কথা, গ্রিকদের ঈশ্বরপ্রেম ছিল মারাত্মক। 'জ্ঞানান্বেষণের যুগ' ও রেনেসাঁ পেরিয়ে আসা ইংরেজরা কিছুতেই মানতে পারেনি, গ্রিক সমাজে মানুষ ভগবানের আরাধনা করত মালকড়ি ফেলে! কিন্তু এটাই সত্য। ঐতিহাসিক রোডস বলছেন, গ্রিকদের নীতি ছিল যত বেশি পরিমাণ উপঢৌকন জমা হবে, দেবতা তত বেশি প্রীত হবে। ফলে অনেকেই লিখে দিত, 'আমি এইটে দিলাম, বিনিময়ে তুমি আমাকে এইটে দেবে!' দেবতার সঙ্গে এরকম আদান-প্রদানের জেরেই বহু গ্রিক দেবতা গল্পের নায়ক হয়েছিলেন, সর্বোপরি বহু গ্রিক নায়কের পিতৃত্ব দেবতা ও মাতৃত্ব মানবের ঘাড়ে চাপতে পেরেছিল। স্বয়ং গ্রিকবীর অ্যাকিলিস যাদের একজন।

গ্রিকদের এই দেবপ্রীতি বিখ্যাত গ্রিক ট্রাজেডিতেই পরিষ্কার। শোনা যায়, আন্তিগোনের অভিনয়ের পরেই নাকি সফোক্লিসকে পুরস্কারস্বরূপ একটি গ্রিক বাহিনীর প্রধান করে দেওয়া হয়েছিল। সফোক্লিস হোক বা ইউরিপিডিস, গ্রিক নাটকের মূল কথাই হল নৈতিকতা, হৃদয়াবেগ, বিনয় ও কারুবোধের প্রতি সম্মান। এই রোমান্টিক হাওয়ার আঁচ পরবর্তী কয়েক হাজার বছরেও পুরোনো হয়নি। সে সাহেবদের থিয়েটারই হোক বা পরবর্তী বাঙালিদের 'রাজা অয়দিপাউস', সফোক্লিস আজও প্রাসঙ্গিক। ইতিহাসের বাস্তব জীবন অবশ্য ঠিক এর উলটো ছিল। লোভ, উগ্রতা, আদিরস, ক্রীতদাসপ্রথা, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ছাড়া প্রাচীন এথেন্সের জীবনযাত্রাকে ভাবাই যেত না। একদিকে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ, অন্যদিকে লাগামছাড়া জীবনবাদ। এই দুইয়ের আদর্শ মিশ্রণ ছিলেন সম্রাট আলেকজান্ডার। একদিকে চরম খেয়ালি, নির্মম, হিংস্র, রক্তপিপাসু— অন্যদিকে দয়ালু, উদার, বীরপূজারি। আমরা শুধু পুরুর 'রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার'টাই শুনেছি। আলেকজান্ডারের এমন ব্যবহার আরো অনেক আছে। পারস্যের সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে তিন বার যুদ্ধ করেও তিন বারই হেরে যান। শেষ যুদ্ধটা হয়েছিল বর্তমান ইরাকের ইরবিল শহরের কাছে। দরায়ুস পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর অবস্থা হয়েছিল সিরাজের মতো। নিজেরই এক অনুচর তাঁকে ধরে ফেলে নির্মমভাবে গোরুর গাড়ির তলায় পিষে মেরে হত্যা করে। চিরশত্রুর এই খবর পরাজিত পারস্যের রাজধানীতে আসতেই আলেকজান্ডার অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তার পরের ঘটনা ইতিহাসেও বিরল। আলেকজান্ডারের নির্দেশে এক বিশাল ম্যাসিডন বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় ও ছিন্নভিন্ন পারস্যের শেষ সম্রাটের দেহাবশেষ সংগ্রহ করে রাজধানী পার্সিপোলিসে নিয়ে আসে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতির মর্যাদা কেবলমাত্র যুদ্ধে হেরে ক্ষুণ্ণ হবে, এটা আলেকজান্ডার মানতে পারেননি। সম্রাটের নির্দেশে পার্সিপোলিসের প্যাসারগাদেতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তৃতীয় দরায়ুসের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শোনা যায়, সবসময় আলেকজান্ডারের সঙ্গে থাকত হোমারের ইলিয়ডের একটি পুঁথি।

তবে সবচেয়ে চরম খারাপ অবস্থা গ্রিক সমাজে ছিল বোধ করি মেয়েদের। প্রথম ও শেষত, গ্রিক সমাজে নারীস্বাধীনতার চিহ্নমাত্র ছিল না। গ্রিকরা মনে করত, নারী একান্তই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। প্রাচীন গ্রিক কবি সেমোনিডিস লিখছেন, নারীর স্বভাবের কারণ তাকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন শৃগাল এবং কুকুর থেকে! সম্ভবত এই থেকেই ইংরেজিতে 'ভিক্সেন' বা অধুনা মার্কিন গালাগালে 'বিচ' বোঝাতে মহিলাদের ইঙ্গিত করা হয়। সোলোন মেয়েদের সমস্ত রকম সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করেছেন। বিবাহিত মেয়েরা সাধারণত এথেন্সের উগ্র পৌরুষ জীবনযাত্রায় ঘরবন্দিই থাকত। তাদের কোথাও যাওয়ার বা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ারও অনুমতি থাকত না। যতই

রাজকুমারী আন্তিগোনেকে নিয়ে নাটক লেখা হোক, নরম্যান ক্যান্টর সোজাসুজিই লিখেছেন, এথেন্সের মহিলাদের মাথাও ঘোমটায় ঢাকা থাকত, অনেকটা আজকের মুসলিম দেশের মতো। পুরুষরা ইচ্ছে হলে সময় দিত, নয়তো তারা বেশ্যালয়েই কাটাত। বেশ্যারা অনেকেই নৃত্যগীতে পারদর্শী হতেন। মনোরঞ্জনের অভাব হত না। শুনলে অল্পবিস্তর মনু এবং অনেকটাই উনিশ শতকের চিৎপুরের কথা মনে পড়ে যাবে। গণতান্ত্রিক এথেন্সের এই ছিল ছবি। যদিও, গণতন্ত্র নামেই। এথেন্সের গণতন্ত্রের অংশীদার হতে পারত মাত্র হাজার দশের অভিজাত। আইনসভার অধিবেশন বসত অবশ্য, নিয়ম করে। কিন্তু যুদ্ধবাজ ও সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী এথেন্সের আইনসভায় অধিকাংশ বিষয় থাকত ওই যুদ্ধ-সংক্রান্তই। সমাজকল্যাণ ও দুর্দশা থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতে যুদ্ধের সাহায্য নেওয়ার এই প্রথা এথেন্স, রোমান রিপাবলিক, কার্থেজ, পারসিপোলিস, ব্যাবিলন পেরিয়ে এমনকী ওয়েস্টমিনস্টার এবং এস্টেট জেনারেলেও সমানভাবে জনপ্রিয় থেকেছে। অধুনা হোয়াইট হাউস, ক্রেমলিন এবং সংসদ ভবন ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে এটি কার্যকর করে চলছে।

আজ ইতিহাসের নানা নতুন ভূমিকা সামনে এসেছে। কোথাও ইতিহাসকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, কোথাও ইতিহাসকে বানানো হচ্ছে, কোথাও নামে আহমেদাবাদ, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ, মুঘলসরাই থাকলেই সেসব পালটে ফেলা হচ্ছে। আসলে মানুষের তাই স্বভাব। হেরোডটাস লিখেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষ তাই শুনতে চায় যা সে শুনতে পছন্দ করে, তারা সত্য-মিথ্যার পরোয়া করে না। হিস্টোরিয়া গ্রন্থে লিখেছিলেন ক্রোয়েসাস ও সোলোনের কথোপকথন। সেকালে ব্রিটিশদের গ্রিক উপাসনা থেকে একালের ভারতীয়দের হিন্দু উপাসনা এই চরম সত্যিকেই বার বার প্রমাণ করেছে। ফলে সত্যানুসন্ধান নয়, ইতিহাস হয়ে পড়েছে সাদা বনাম কালোর লড়াই। দাবা খেলার শুরুতেই যেন ঠিক হয়ে যাচ্ছে যে, কে সাদা আর কে কালো। থুকিডিডিস লিখেছেন, লোকজন আজকাল সত্যানুসন্ধানে পরিশ্রমের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রেডিমেড উত্তরকে। মনে রাখতে হবে, থুকিডিডিসের 'আজকাল' মানে খ্রিস্টজন্মের চার-শো বছর আগের কথা! পেলোপনেসীয় যুদ্ধের প্রাচীনতম প্রামাণ্য ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইতিহাসের প্রথম বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন, 'My narrative perhaps, will seem less pleasing to some listeners because it lacks the element of fiction. Those, however, who want to see things clearly as they were; and given human nature, as they will one day be again, more or less, may find this book a useful basis for judgment' (Thucydides, *The Peloponnesian War,* New York, W W Norton, 1990'।

ব্রিটিশদের গুরু বাছাইতে ভুল ছিল না। দীক্ষাও কিছু খারাপ হয়নি। ছাত্র হিসেবেও ব্রিটিশদের মতো মনোযোগী কমই আছে। গ্রিক ইতিহাস ও জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্য সত্যিই ঈর্ষণীয় এবং তা সর্বকালেই প্রাসঙ্গিক। শুধু সাহেবদের জানা ছিল না, তাঁদের এই ঝোঁকের আভাসও গ্রিক পণ্ডিতরা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কোন সত্যযুগে!

পিপ্‌রাহ্‌ওয়ায় প্রাপ্ত একটি লেখ এবং কিছু সমস্যা

নিতাই জানা

উইলিয়ম ক্ল্যাক্সটন পেপে নামের এক ইঞ্জিনিয়ার, তিনি আবার শখের প্রত্নতাত্ত্বিক, উত্তরপ্রদেশের বস্তি জিলার পিপ্‌রাহ্‌ওয়ায় (বর্তমানে সিদ্ধার্থনগর জিলা) কিনে নেন বিশাল এক জমিদারি। সেই জমিদারির মধ্যে কিছু পাহাড়প্রমাণ ঢিপি খনন করতে গিয়ে পাওয়া গেল একটি স্তূপ। স্তূপের ভেতর থেকে মিলল একটি পাথরের পেটিকা, যার ভেতরে পাঁচটি পাথরের কৌটো ছিল। সেই কৌটোগুলির একটির মধ্যে কিছু ছাই আর ওই কৌটোর বাইরের গায়ে গোল করে লেখা ছিল যুক্তাক্ষর-বর্জিত একটি বাক্য। যেহেতু গোল করে লেখা, তাই কোন শব্দ থেকে পড়া শুরু হবে, কোথায়-বা শেষ হবে— তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানান মত দেখা দিল। বাক্যটি, বলা বাহুল্য, প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা: 'সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং'। বিখ্যাত এপিগ্রাফিস্ট জর্জ বুলার সাহেব 'সুকিতিভতিনং' থেকে পড়া শুরু করে এর অর্থ করেন: 'This relic-shrine of the divine Buddha (is the donation) of the sakya-sukiti brothers associated with their sisters, sons, and wives! এই পাঠ এবং অর্থ অনেকে মেনে নেন, আবার অনেকে মানলেন না! না-মানা পণ্ডিতগণের মধ্যে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও অন্যতম। হরপ্রসাদবাবু পাঠ শুরু করেন 'ইয়ং সলিলনিধনে' থেকে। এবং অর্থটি এরকম: 'এই যে শরীর নিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও সুত দারার সহিত'। বলা বাহুল্য, বাক্যটি ঘিরে যেমন রহস্য তৈরি হয়, তেমনি কৌটোর ভেতর কার বা কাদের 'সলিলনিধন'— সে প্রশ্নও তুমুল হয়ে দেখা দেয়।

আমরা জানি, ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই বুদ্ধ-অনুগামীগণ সঙ্গীতি বা মহাসম্মেলনের আহ্বান জানান বুদ্ধের বাণী ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনার তথ্য-সংকলনের উদ্দেশ্যে। রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিনয় আবৃত্তি করেন উপালি। আর সুত্ত আবৃত্তি করেন আনন্দ। সুত্ত অর্থাৎ সুত্তপিটক। পাঁচটি নিকায় অর্থাৎ সংকলনে বিভক্ত এই সুত্তপিটক। এর প্রথম নিকায় দিঘনিকায়। দিঘনিকায়ের ১৬ সংখ্যক সুত্তের নাম মহাপরিনিব্বান সুত্ত। এই সুত্তে তথাগতর শেষ সংলাপ বর্তমান। এবং মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলিও বিশদে বর্ণিত।

এখানেই আমরা জানতে পারি, মল্লদের কুশিনারার শালবনে মৃত্যুর পর তথাগতকে দাহ করা হয় চন্দন কাঠের আগুনে। আর মল্লরাজগণ (গণরাজ্য অর্থাৎ অনেক রাজা বা শাসক) চিতাভস্মের কোনো ভাগ অপর কোনো ব্যক্তি বা রাজ্যকে দিতে অস্বীকার করেন যেহেতু তাঁদের রাজ্যে দেহ রেখেছেন ভগবান। অথচ চিতাভস্মের দাবি নিয়ে উপস্থিত ছিল রাজগৃহের বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর সৈন্যসামন্ত, বৈশালীর লিচ্ছবীগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদীপের ব্রাহ্মণ ও পাবা গণরাজ্যের মানুষজন। তুমুল তর্কবিতর্ক এবং যুদ্ধপরিস্থিতি সামাল দেন দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ। তাঁর মধ্যস্থতায় আসন্ন যুদ্ধ থেমে যায়। এবং মোট আট ভাগে সলিলনিধন অর্থাৎ শারীরিক অস্থিধাতু ভাগ করে সবার দাবিদাওয়া পূরণ করেন। এরপর প্রত্যেকেই একটি আধার-পাত্র অথবা পাথরের কৌটায় সলিলনিধন স্থাপন করে তার ওপর স্তূপ নির্মাণ করেন নিজ নিজ রাজ্যে।

রাজগৃহের মহাসঙ্গীতিতে এই পরিনিব্বান সুত্ত আবৃত্তি করেন আনন্দ। তিনি কেবল প্রধান শিষ্য নন, শাক্যবংশের সন্তান, তথাগতর ভাইপো, ছায়াসঙ্গী এবং সর্বক্ষণের সেবক। তাঁকে সবাই বলতেন ধর্মভাণ্ডারিক। যেহেতু বুদ্ধর সমস্ত দেশনা অথবা উপদেশ তাঁর কণ্ঠস্থ। তাই, বুদ্ধদেব-এর বিশ্বস্ত অনুগামী আনন্দ সঙ্গীতিস্থলে যে বর্ণনা রেখেছেন, তা আমরা সত্য মনে করতে পারি। এবং দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ, যিনি মীমাংসক, তিনি পাত্রাধারে ছেনি কেটে লিখেও দেননি নিশ্চয়। যে পাথরের কৌটো বা মঞ্জুষা পাওয়া গেল পেপে সাহেবের জমি পিপ্‌রাহ্‌ওয়ায়, সে কৌটোর গায়ে যদি কেউ লিখে থাকেন, তাহলে সে লিখনের অধিকারী শাক্যগণ। যাঁরা লিপি বিশারদ, তাঁরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের এই লেখ

প্রথম পর্বের ব্রাহ্মী অক্ষর। এর সঙ্গে মিল আছে বর্লীগাঁওতে পাওয়া লিপির।

এ প্রসঙ্গে ফ্লিট সাহেব ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গের উৎস আছে বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর ও অট্ঠকথায়। বুদ্ধদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন কোশলের রাজা পসেনদি (প্রসেনজিৎ)। এই শ্রদ্ধা থেকেই শাক্যবংশের কোনো রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু শাক্যগণ জানতেন, কোনো উচ্চ বংশের সন্তান নন পসেনদি। তাই তাঁরা ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাজা মহানাম-এর ঔরসে ক্রীতদাসী গর্ভজাত এক কন্যাকে রাজকন্যা পরিচয় দিয়ে পসেনদির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পন্ন করেন। এই কন্যার নাম বাসবখত্তিয়া (বাসবক্ষত্রিয়া)। এই বাসবখত্তিয়া এক ক্রীতদাসীকন্যা— একথা অনেক পরে জানতে পারেন পসেনদি, যখন মাতৃকুলে অর্থাৎ মামার বাড়ি গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এল পুত্র বিড়ূড়ভ (বিদুর্দভ)। রাজা পসেনদি যখন স্ত্রী ও পুত্রকে নির্বাসন দেবেন মনস্থ করেন তখন তথাগত বুদ্ধ তাঁকে নিরস্ত্র করেন এবং বাসব প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয়কন্যা বলে পরিচয় রাখেন। পসেনদি তথাগতর উপদেশ মেনে নেন। কিন্তু বিড়ূড়ভ রাজা হয়েই অপমানের প্রতিশোধ নিতে শাক্যবংশকে ধ্বংস করেন। এই হত্যাকাণ্ডে নারী বা শিশু কেউই রেহাই পায়নি। এ কারণে ফ্লিট এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত মনে করেন, সেইসময় শাক্য গণরাজ্য ভেঙে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠা হয় কোশলের অধিকার। আর পিপ্রাহ্ওয়ায় পাওয়া সলিলনিধন সেই নিহত নর-নারীর শরীরধাতুর স্মারক। যেহেতু লিখিত বাক্যে বুদ্ধদেবের ভাই-ভগিনীর উল্লেখ আছে। আরো আছে 'দলনং' শব্দটি। সংস্কৃত ভাষায় এ শব্দের অর্থ দলিত করা।

লিপিটির পাঠ নিয়ে মতান্তর রইলেও পিপ্রাহ্ওয়া স্তূপটি সম্রাট অশোকের অনেক পূর্বে নির্মিত বলেই মেনে নিয়েছেন পণ্ডিতগণ। গোলাকার বৃত্তে স্তরে স্তরে ১৫″ × ১০.৫″ ইটে গড়া স্তূপটির মাটির উপরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১১৬ ফিট। মাটি থেকে সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ২১′৬৫ ফিট। পি সি মুখার্জি আরো বলেন, স্তূপের মাঝের অণ্ডের ব্যাস ৬৩ ফিট ৬ ইঞ্চি।

পেপে সাহেব খুঁড়েছেন ১৮৯৭-৯৮ সালে। তারপর ১৯৭৩ সালে পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলি খুঁড়তে স্তূপের পূর্বদিকে পাওয়া গেল একটি বৌদ্ধবিহার। সেখানে মিলল প্রায় ৪০টি টেরাকোটা সিল। তাদের কোনোটাতে লেখা: 'ওম দেবপুত্র বিহার কপিলবস্তু ভিক্ষুসংঘ।' আবার কিছু সিলে লেখা আছে: 'মহা কপিলবস্তু ভিক্ষুসংঘ।' কিছু সিলে নামও খোদিত ছিল, যেমন: 'সরনদাস্স' ইত্যাদি।

কপিলবস্তু থেকে ১ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, খননের ফলে পোড়া ইটে তৈরি ২৫ কক্ষ এবং একটি গ্যালারিযুক্ত বাড়ি পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, উত্তর-পূর্বে, আরো একটি বাড়ি আবিষ্কৃত হল, যেখানে ছিল ২১টি কক্ষ। স্থানটির নাম গনোরিয়া। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই ইটগুলি কপিলবস্তু স্তূপ সমকালীন, কোনো প্রাসাদ। পিপ্রাহ্ওয়া এবং সংলগ্ন অঞ্চলের এই আবিষ্কারগুলি, বলা বাহুল্য, প্রকৃত কপিলবস্তু স্থানটি কোথায় অবস্থিত, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলে। কেন না, সবাই এতদিন জেনে এসেছে, কপিলবস্তু স্থানটি নেপালের তিলৌরাকোট এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল। এবং হিউএন সাঙ-এর বিবরণ পড়ে তাই মনে হয়।

সত্যি বলতে কী, আজ থেকে ১৩৫/৩৬ বছর আগের আধুনিক ভারতবাসী জানত না, লুম্বিনী, কপিলবস্তু কুশিনারা শ্রাবস্তী ইত্যাদি বৌদ্ধ স্থানগুলি ভারতবর্ষের কোথায় অবস্থিত। যেন বুদ্ধদেব-এর পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ স্থানগুলিও নির্বাণপ্রাপ্ত। এইরকম এক সময়ে ফরাসি পণ্ডিত স্তানিশ্লা জুলিএন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএন সাঙ-এর নাম শুনলেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু নাকি প্রাচীনকালে ভারত ভ্রমণ করে একটি বই লিখেছেন। চিনা ভাষায় লেখা সে গ্রন্থের নাম 'সি-ইউ-কি'। স্তানিশ্লা প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস জানার আগ্রহে দুরূহ চিনা ভাষা শিখে গ্রন্থটির অনুবাদ করেন ফরাসি ভাষায়। এবং এর পরে-পরেই বিদেশীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ স্থানগুলি খুঁজে পেতে উঠে-পড়ে কাজ শুরু করেন।

এ বিষয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন আলেকজান্ডার কানিংহাম। সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লর্ড ক্যানিং প্রতিষ্ঠিত সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সার্ভেয়ার পদে যোগ দেন। আর কিছু পরে তৈরি করেন অতি উন্নত একটি সার্ভে টিম, যখন সংস্থাটির ডিরেক্টরের পদ পেলেন তিনি। কারলিল, বুকানন প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেন হিউএন সাঙ-এর ভ্রমণপথের মানচিত্র। হিউএন দূরত্ব নির্ণয় করতে ব্যবহার করেন চৈনিক লি বা মাইল। কয়েক স্থানে আবার যোজন। এই যোজন আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। তা ছাড়া স্থানগুলির নামও চৈনিক ভাষায় লিখিত। যেমন: কিএপি-লো-ফসসে-তি, কও-সিন-লো, শি-লো-ফু-শি-তি ইত্যাদি। যাই হোক, কানিংহাম-এর দলবল অনেক কষ্টে প্রাচীন স্থানগুলি খুঁজে পান। যদিও তার মধ্যে ২/১টি ভুল ছিল। এবং তাঁদের আবিষ্কৃত কপিলবস্তু স্থান নির্বাচনও ভুল ছিল। কেননা, ভুঁইলাতাল নামক একটি পুষ্করিণীর চারপাশের ভগ্নাবশেষ বা কপিলা হিউএন কথিত কিএপি-লো-ফসসে-তি বা কপিলবস্তু নয়।

পিপ্রাহ্ওয়ায় প্রাপ্ত লিপির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে যেমন বিতর্ক তেমনি কপিলবস্তু স্থানের প্রকৃত অবস্থিতি খুঁজে পেতেও শুরু হয় তুমুল তর্কবিতর্ক। ধর্মীয় বৌদ্ধগ্রন্থগুলির কপিলবস্তু বর্ণনা

মানতে পারেননি ঐতিহাসিকেরা। তাঁরা জোর দেন চাক্ষুষ বর্ণনার ওপর। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা নির্ভর করেন যে দুজনের ওপর, বলা বাহুল্য, সেই দুজন ফা-হিএন ও হিউএন সাঙ। উভয়েই চৈনিক পরিব্রাজক। প্রথম জন ফা-হিএন। আসেন ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে। দেশে ফেরেন ১৪ বছর পর ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিউএন সাঙ। ভারতের মাটিতে পা রাখেন ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে। এবং নিজ দেশে ফেরেন ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে, পনেরো বছর পর। এই দুজনের চাক্ষুষ বিবরণ ভারতবর্ষ তথা কপিলবস্তু জানার পক্ষে প্রধানতম উপাদান। দুজনেই কপিলবস্তু এসেছেন সাবত্থি বা শ্রাবস্তী থেকে। কিন্তু দুজনেরই যাত্রাপথ বর্ণনা এবং পথের মাপে বিস্তর ফারাক।

ফা-হিএন শ্রাবস্তী থেকে ৫০লি উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে কশ্যপবুদ্ধ-এর জন্মস্থান ঘুরে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসেন আবার। এরপর শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২ যোজন পথ অতিক্রম করে নাপিকা নগরে দর্শন করেন ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের জন্মভূমি। তারপর নাপিকা থেকে মাত্র ১ যোজন দূরে পৌঁছে দর্শন করেন কনকমুনি বুদ্ধের জন্মস্থান। এই কনকমুনির জন্মস্থল থেকে মাত্র ১ যোজন দূরে কপিলবত্থু বা কপিলবস্তু। তিনি আরো লেখেন: লুম্বিনী অর্থাৎ যেখানে গোতম (গৌতম) জন্ম নেন, কপিলবস্তু থেকে মাত্র ৫০লি পূর্বে অবস্থিত।

হিউএন সাঙ শ্রাবস্তী থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৬ লি পথ হেঁটে উপস্থিত হন কশ্যপ বুদ্ধর শহরে। এখান থেকে দক্ষিণ বরাবর প্রায় ৫০০ লি পথ পেরিয়ে পৌঁছোন কপিলবস্তু। তারপর ৫০ লি উত্তর-পূর্বে হেঁটে পেয়েছেন ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধর জন্মস্থান। আবার উত্তর-পূর্বে ৩০ লি গিয়ে পৌঁছোন কনকমুনির জন্মস্থলে। কনকমুনির জন্মস্থলে একটি স্তূপ এবং তার পাশেই দেখেন স্তূপ নির্মাণের বিবরণ-সংবলিত একটি স্তম্ভ— যা রাজা অশোকের তৈরি। স্তম্ভের মাথায় ছিল সিংহমূর্তি। কপিলবস্তুর দক্ষিণ-পূর্ব দিকেও একটি স্তূপ তিনি দেখেন যেখানে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রক্ষিত। পাশে ছিল লিপি-সংবিদিত একটি স্তম্ভ। পাঠ করে জানতে পারেন: অশোক রাজার তৈরি এই স্তূপ এবং লেখ। কপিলবস্তুর দক্ষিণে ৩/৪লি দূরে একটি বটবৃক্ষ তিনি দেখেন। তার পাশে ছিল অশোক নির্মিত একটি স্তূপ। বুদ্ধত্ব লাভের পর এই বটের ছায়ায় নিজের পিতাকে ধর্মের ব্যাখ্যান শোনান তথাগত।

কপিলবস্তু থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৩০লি হেঁটে একটি ঝরনার ধারে একটি স্তূপ দেখেন তিনি। ঝরনাটির সৃষ্টি হয়েছিল গৌতমের অস্ত্রশিক্ষাকালে শরের আঘাতে। একে তাই স্থানীয়রা বলেন: শরকূপ। এই শরকূপ থেকে আরো উত্তর-পূর্বে ৮০/৯০ লি হাঁটলে পাওয়া যাবে লুম্বিনী, যেখানে বুদ্ধের জন্ম।

বলা বাহুল্য, আরো অনেক স্তূপ দেখেছেন হিউএন সাঙ। কিন্তু ফা-হিএন লিখিত বিবরণে যে যোজন বা লি নির্দেশিত তা হিউএন-এর সঙ্গে মেলে না। ভারতীয় মাপে ১ যোজন প্রায় ৯ মাইল। আর ভারতীয় ১ মাইল বলতে বোঝায় চৈনিক ৪.৫ লি প্রায়। হিউএন সাঙ নির্দেশিত পথরেখা ধরে কানিংহাম, কার্লাইল প্রমুখ ব্যক্তি ভুঁইলাতালটিকে কপিলবস্তু চিহ্নিত করলেও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক তা মেনে নেননি। নেপালে নিগালীসাগর নামক স্থানে একটি স্তূপ পাওয়া যায়। স্তূপের গায়ে লেখা: 'অভিষেকের বিশ বছর পর অশোক এখানে এসে পূজা দেন এবং শিলাস্তম্ভটি উত্থাপিত করে পূর্ব বুদ্ধ কনকমুনির স্তূপটিকে দ্বিগুণ আকারে বর্ধিত করেন।' আবার নিগালীসাগর থেকে ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোটিহ্ওয়াতে একটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্তূপের পাশে একটি স্তম্ভের নিম্নাংশ এখনও বর্তমান। অনেকে মনে করেন, এই স্তম্ভটিই নিগালীসাগরে প্রোথিত করা হয় পরবর্তীকালে।

দুজন পরিব্রাজক ভিক্ষুর বর্ণনা পড়ে এবং তিলৌরাকোট (নেপাল) ও পিপ্রাহ্ওয়া (ভারত)-র মতোই দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন পৃথিবীর পণ্ডিতগণ। কেননা, হিউএন-এর বর্ণনা মেলে তিলৌরাকোটে। আবার ফা-হিএন-এর বর্ণনা মিলে যায় পিপ্রাহ্ওয়ায়। দূরত্বের দিক থেকে মিলে যায় ফা-হিয়েন কথিত পিপ্রাহ্ওয়া ও লুম্বিনীর পথ। মাত্র ১২ মাইল অর্থাৎ চৈনিক ৫০ লির সমান প্রায়। কিন্তু দুজনের কেউই রোহিনী নদীর উল্লেখ করেননি। অথচ এই নদীর জল নিয়ে যুদ্ধে উদ্যত হয়েছিলেন শাক্য এবং কোলিয়গণ। বুদ্ধদেব আসন্ন যুদ্ধ থামিয়ে মীমাংসা করেন, এবং তা মেনে নেন উভয়পক্ষ।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে নেপালের তিলৌরাকোট অঞ্চলে খনন করা হয় ১৯৬২ সালে। তার নেতৃত্বে ছিলেন দেবলা মিত্র। প্রাকার ও পরিখা বেষ্টিত তিলৌরাকোটের বিশাল ঢিপি কপিলবস্তুর উপযুক্ত স্থল বলে বিবেচিত হলেও খননকালে মৌর্যযুগের বেশ কিছু প্রত্নবস্তু ও মৃৎপাত্র ছাড়া বৌদ্ধযুগের তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি, যা থেকে প্রমাণ হবে কপিলবস্তু নামক অতীত স্থানটি এখানেই ছিল। তুলনায় পিপ্রাহ্ওয়া ও গনোরিয়ার প্রত্নবস্তুগুলি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে স্থান কপিলবস্তুর অবস্থিতি সম্পর্কে। এই প্রমাণ হয়তো আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে যদি পিপ্রাহ্ওয়া ও গনোরিয়াতে চালানো হয় আরো ব্যাপক খনন।

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রাচীন কপিলবস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু লিপিটির পাঠ নিয়ে চলতে থাকবে তর্কবিতর্ক। এখানে কেবল একটি কথা মনে হয়: খ্রিস্টজন্মের চার-পাঁচ-শো বছর পূর্বে কোনো মঞ্জুষা বা কৌটোর গায়ে যা লেখা হয়, তা সেদিনের মানুষের কথনের বর্ণমালা বা অক্ষরসমষ্টি। যে মানুষের সলিলনিধন বা ছাই শীতলে শায়িত, তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা গ্রহণ করে আছে অক্ষরগুলি। আজকের পাঠক সেই লিপি

পাঠ করে নিজের মতো অর্থ তৈরি করছেন বা করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেই মানুষ বা তাঁদের মুখের ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত। ভাষা যদিও-বা বেঁচে থাকে, হারিয়ে গেছে সেদিনের অর্থ। সেই অর্থাশ্রিত শব্দ বা বাক্যে আজকের ব্যাকরণশাস্ত্রও অচল। আজকের অন্বয় পদ্ধতিও সেই বাক্য পাঠে কোনো নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে অপারগ। সংস্কৃত ভাষা-পদ্ধতি সেখানে আরোপিত হওয়া বোধ হয় অনুচিত।

অশোক পূর্বকালের এই ভাষা অবশ্যই আদি পালি ভাষা। সেই আদি পালির সমকালীন অন্যান্য লেখ বা পুঁথিও নেই, যা দিয়ে তুলনামূলক একটি পাঠ প্রস্তুত হতে পারে। রাজস্থানের ভাবরুতে পাওয়া শিলালিপিতে ভিক্ষুদের প্রতি যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠের অনুরোধ জানান রাজা অশোক, সে ধর্মগ্রন্থগুলিও পরবর্তীকালের বৌদ্ধসাহিত্য বা ত্রিপিটকে গৃহীত হয়নি। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এই গ্রন্থগুলির স্থান নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই পরবর্তীকালের পালি শব্দসমূহের অর্থ গ্রহণে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। লেখমধ্যে 'দলনং' শব্দটির সংস্কৃত অর্থ নিপীড়ন বা হত্যা। কিন্তু পালি ভাষায় অর্থাৎ জাতকের গল্পে দলয়তি (Dolayati) শব্দের অর্থ করা হয়েছে: বেরিয়ে যাওয়া, দূরে যাওয়া। প্রশ্ন ওঠে বা উঠতে পারে: বুদ্ধদেব কি শাক্য ভাই-বোনদের ছেড়ে দূরে চলে যাননি!

তাই মনে হয়, ঢেলে, নতুন করে আবার খোঁজার সময় এসেছে। এই খোঁজ হবে তন্ন তন্ন পাঠ, বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যের নবজন্ম: প্রসঙ্গ আফ্রিকা

সলিল চট্টোপাধ্যায়

এ কথা ভাবলে বিস্মিতই হতে হয় যে আফ্রিকা মানবের আদি জন্মভূমি, যন্ত্র-সভ্যতার দৌড়ে সবচেয়ে পেছনে পড়েছিল সে দেশের মানুষ। ওই মহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইসলামি আগ্রাসনে আরবি বণিকদের হাত ধরে যেটুকু উন্নয়ন এসেছে তার চাইতে বেশি এসেছে দাস-ব্যাবসার প্রসার। সুদান, আবিসিনিয়া, সোমালির সরল কালো মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। বিজেতা শাসকদের ক্রীতদাস হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে অপমান আর সবরকম লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে দেশ থেকে দেশে। এমনই এক আবিসিনিয়ার দাসকে আমাদের ইতিহাসেও খুঁজে পাই, রীতিমতো দাগ রেখে গেছেন— তিনি মালিক কাফুর।

কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি শ্বেতাঙ্গ আগ্রাসকদের ক্ষেত্রেও। নিজেদের দেশে যতই-না কেন 'লিবর্তে-ইগালিতে-ফ্রাতরনিতে'র বিশ্বভ্রাতৃত্বের গণতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরুক, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি তাদের উপনিবেশ শাসনে। বরং প্রতিবাদী মানুষের গলা টিপে— তাদের অস্তিত্বটুকুও মুছে দিতে দেরি করেনি, যেমন আমাদের বাংলায় পাঞ্জাবে বা আফ্রিকার নাইজেরিয়ায়, ঘানায়, এ্যাঙ্গলায়, কেনিয়ায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বার বার। তাদের তাত্ত্বিক দার্শনিকরা এই কথাই প্রচার করেছে কালো মানুষেরা ঠিক মানুষ নয়, বিবর্তনের অনেক পেছনে পড়ে থাকা হোমিনিড্স। ওদের নৃতাত্ত্বিকরা নাকি পরীক্ষা করে দেখেছে কালোদের মস্তিষ্কটা ওদের চাইতে ছোটো।

এই ধারণার ব্যাপক প্রচার করেছে সাদাদের সাহিত্যও। যেমন জোজেফ কনরাডের 'হার্ট অব ডার্কনেসে', রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী', ড্যানিয়েল ডি ফো'র কিশোর বয়সে পরম আগ্রহে শেষ করা সেই অ্যাডভেঞ্চার 'রবিনসন ক্রুশো'য়। আমাদের হয়তো নজর এড়িয়ে গিয়েছে কীভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের মনুষ্যেতর প্রাণী হিসেবে দেখানো হয়েছে এইসব বিখ্যাত বইতে। আমরাও ভাবতে শিখেছিলাম যে আফ্রিকা মানেই বাঘ-সিংহ গণ্ডার এবং হিংস্র নরখাদক অর্ধপশু মানুষের দেশ। তাঁদের যে কোনো ঐতিহ্য, কোনো প্রাচীন সাহিত্য আছে বা থাকতে পারে এ খবরগুলো যারা আফ্রিকা সম্বন্ধে জানত তারাও কখনো বলেনি। এবং কিছুই না জেনে বা জানার চেষ্টা মাত্র না করে যা-তা মন্তব্য করে গেছে। এই সাহিত্যিক দুর্বৃত্তদের তালিকায় ইদানীং সংযোজিত হয়েছে নোবেলবিজয়ী বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নইপল। অবশ্য নইপল পশ্চিমি। সভ্যতার বাইরে সবরকম সভ্য উন্নত সাহিত্য সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকেই নস্যাৎ করেছে, যা থেকে তার পূর্বপুরুষের দেশ ভারতবর্ষও অব্যাহতি পায়নি। তার আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনি 'বেন্ড ইন দ্য রিভার'-কে 'কুৎসা' বলাই সংগত।

আফ্রিকা নিয়ে লেখা অনেক হয়েছে সেই ১৬৮৮ থেকে, বিংশ শতকেও কম হয়নি। কয়েকটির নাম বলা যেতে পারে যেগুলোতে একটা চেষ্টা সবসময় লক্ষ করা যাবে তা হল ওই 'কালো মানুষদেরকে আর সবার মতো মানুষ ভাবার কোনো কারণ নেই'। উনবিংশ ও বিংশ শতকের গোড়ায় এরকম প্রচারের একটা গভীর অর্থনৈতিক কারণ ছিল যে দাস-ব্যাবসাকে ন্যায়সংগত বলে প্রতিষ্ঠা করা। বুনো ঘোড়া বা বুনো গরুকে ধরে এনে যেমন মানুষের কাজে লাগানো তেমনি ছিল এই কালো মানুষদের ধরে এনে ক্রীতদাস করে খাটিয়ে মারা। লুণ্ঠন শোষণ এবং শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আইন চাপিয়ে শান্তিরক্ষার অজুহাতে নির্বিচারে গ্রামবাসীদের হত্যা করা। কালো মানুষ চুরি করলে ফাঁসি, সাদা মানুষ যদি কালোকে খুন করে তার পেছনে সর্বদাই সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে, এটাই ছিল সাদাদের দেয়া কালোদের জন্যে 'মানবাধিকার'— 'ইক্যুয়ালিটি বিফোর ল'। বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল তো পরিষ্কার বলেছেন— আফ্রিকার কালোরা 'মানব-বিবর্তনের এক সুপ্রাচীন ধাপে পড়ে আছে'। কাজেই তাদের সভ্য-শিক্ষিত করার জন্য কোনো কঠিন শাস্তিই যথেষ্ট নয়, এবং বেলোয়ারি কাচ বা রঙিন পুঁতির বিনিময়ে বহুমূল্য হাতির দাঁত, কাঁচা সোনা, আকরিক হিরে-জহরত নিয়ে নেয়াটাও সেসবের উপযুক্ত ব্যবহার মাত্র। 'শান্তি পুনঃসংস্থাপন' বা 'রেস্টোরেশান অব পীস' নাম দিয়ে নাইজেরিয়া এবং পশ্চিম-আফ্রিকার দেশগুলিতে যে

নৃশংস তাণ্ডব সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা চালিয়েছে তাও এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত।

ইংরেজিতে লেখা এরকম কিছু উপন্যাস যেমন:

১। ওরোমোকো— আফ্রা বেহন (১৬৮৮) ২। ক্যাপ্টেন সিঙ্গলটন/রবিনসন ক্রুশো— ড্যানিয়েল ডি ফো। ৩। শী/কিং সলোমনস মাইনস— রাইডার হ্যাগার্ড। ৪। হার্ট অব ডার্কনেস— জোজেফ কনরাড। ৫। মিস্টার জনসন— জয়েস ক্যারি। ৬। হার্ট অব ম্যাটার— গ্রাহাম গ্রিন।

ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাতেও এরকম কুৎসা অনেকই লেখা হয়েছিল। এদের তালিকায় অনেক নামি যেমন 'নইপলে'র উল্লেখ করা হল, ওঁর পূর্ববর্তী এলসপেথ হাক্সলি-ও আছেন। অথচ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার ইসলাম প্রভাবিত এলাকায় উন্নত সভ্যতা ওই উপনিবেশিক দস্যুতা শুরুর অনেক আগে থেকেই ছিল। সেইসব অঞ্চল সভ্য ও শিক্ষিত অবশ্যই ছিল এবং তা ইউরোপীয়দের ধরনের না হলেও। তেমনি বাকি আফ্রিকাও, উপরোক্ত লেখকদের বর্ণনা মতো 'হিংস্র বর্বর নরখাদকে পরিপূর্ণ' কখনোই ছিল না। ওই লেখকরা যে কেউই আফ্রিকা যাননি এমনও নয়। তবু ওসব মনগড়া বিবরণ লিখতে তাদের কোথাও ভাবেনি। বরং সর্বত্র এটাই প্রমাণের চেষ্টা করেছেন— এই কালো মানুষেরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে না। শ্বেতাঙ্গ অধীনতাই তাঁদের জন্যে সবদিক থেকে মঙ্গল।

যদিও ইসলাম প্রভাবিত দেশগুলিতে যেমন আরবি লিপির বহুল প্রচার ছিল, অন্যান্য অঞ্চলেও ভাষা এবং মৌখিক সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন, কিন্তু কোনো বর্ণমালার ব্যবহার ছিল এমন প্রমাণ নেই। তাঁদের ভাষা বা মৌখিক সাহিত্য একইসঙ্গে বয়ে এনেছে প্রাচীন ঐতিহ্য নীতি-আদর্শ এবং সামাজিক ন্যায়ের সুস্পষ্ট ধারা। বিদেশি শাসকেরা প্রথমে এল বাণিজ্যের মহৎ উদ্দেশ্যে। তাদের পিছু পিছু এল ধর্মযাজকেরা খ্রিস্টের 'প্রেমের বাণী' প্রচার রতে। তারপর এল বণিকদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং যাজকদের মহৎ কর্ম নিরাপদ এবং অবাধ করতে সৈন্য এবং প্রশাসন। তারপরে শাসকদের স্বার্থেই আনল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দেশীয়দের জন্যে শাসকদের ভাষা ও লিপি শেখার ব্যবস্থা। ইউরোপীয় ভাষা এবং চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে কখনো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজেও পৌঁছে গেলেন ওই পরাধীন কালো মানুষেরা। তাঁদের কিছু যেমন যা-কিছু আফ্রিকান তাকে ঘৃণা এবং বর্জন করেছিল, অনেকে আবার ওই শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশে ফিরে প্রাচীন ঐতিহ্যকেই চেষ্টা করলেন ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে। এবং আশ্চর্য হবার মতোই সফলও হলেন। তাই ইংরেজি ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের এই নবজন্মের ইতিহাস মাত্র ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের হলেও আজ তা বিশ্বে সম্মানের উঁচু স্থান অধিকার করেছে। এতে এটাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে কালো মানুষেরা আর সব মানুষদের থেকে কোনো কিছুতে ন্যূন নয়, শ্বেতাঙ্গদের মতোই জীবনের সব ক্ষেত্রেই সমান পারঙ্গম।

মৌখিক সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। আমাদের অনেক মহাকাব্য লিখিত রূপ পায় নাকি মাত্র খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ভাষার প্রচলনের হাজার বছর পরে। আফ্রিকার কোনো ভাষায় নিজস্ব বর্ণমালা গড়ে ওঠেনি— এটুকুই বাস্তব। শাসন শোষণের সুবিধের জন্যেই শাসকেরা তাদের ভাষা তাদের সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব, শাসিতদের মনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচার করেছিল। বণিক সংস্থার চাই কম খরচে কর্মচারী। প্রশাসকের চাই সস্তায় রক্ষীবাহিনী। দেশীয়দের পোষা কুকুরের মতো যত্নে এবং শাসনে লালন করা প্রয়োজন। তাই তারা শাসিতদের জন্যে ইংরেজি পঠনপাঠন এবং বুদ্ধিমান মেধাবীদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে বিভিন্ন কৃৎকৌশলে শিক্ষিত দীক্ষিত করে ভক্ত সমর্থক এক বুর্জোয়াশ্রেণি গড়ে তুলেছিল। এই নীতি ইংরেজ ফরাসিরা প্রায় সব উপনিবেশেই কম-বেশি অনুসরণ করেছে। ততে যেমন তৈরি হল তাদের সাম্রাজ্যের এক সমর্থক সহায়ক গোষ্ঠী যাদের চোখে শ্বেতাঙ্গ-শাসনই পারে সভ্যতার এবং বিকাশের অনুকূল পরিবেশ দিতে, সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা গোষ্ঠী হল যার জন্যে শাসকেরা ততটা প্রস্তুত ছিল না, যাঁরা স্বাধীনচিন্তা যুক্তিবাদী দর্শনে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী। তাঁরা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ থেকে দেশে ফিরে স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা দাবি করে বসলেন। ইংরেজির মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করলেন তাঁদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যের নতুন সৃষ্টি— লিখিত সাহিত্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আফ্রিকার প্রথম প্রতিবাদী সাহিত্যিক 'চিনুয়া আচেবে'। ওঁর 'হোম অ্যান্ড একজাইল' গ্রন্থে বলেছেন— 'যতদিন না সিংহদের নিজস্ব ঐতিহাসিক হচ্ছে, সিংহশিকার শুধু শিকারিদের গৌরব-গাথা হয়েই থাকবে।' সার্থক ঘোষণা। এই ঘোষণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন জানতে পাই, তিনি স্বীকার করেছেন— কলম ধরতে অনুপ্রাণিত হবার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 'মিস্টার জনসন'-এর মতো আফ্রিকার সমাজ সংস্কৃতির বিকৃত রূপ প্রচারের প্রতিবাদ করা এবং সত্যরূপ তুলে ধরতে সক্ষম সাহিত্য সৃষ্টি। উনি আশ্চর্যভাবে সফলও হলেন। ওঁর প্রথম উপন্যাস এবং সম্ভবত আফ্রিকার লেখকের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'থিংস ফল অ্যাপার্ট' যার প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাফল্য। এই প্রথম এক 'সিংহ', সিংহ-শিকারের প্রকৃত ছবি তুলে ধরলেন। এ পর্যন্ত ৪৫টি ভাষায় অনূদিত এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত এক কোটি দশ লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রীত। এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ সালে।

এ বইকে অনেকেই আফ্রিকার প্রথম উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। এমন নয় যে ইংরেজি ভাষায় লিখিত আফ্রিকার সত্য রূপ এই প্রথম তুলে ধরা হল। এর আগে ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল নাইজিরিয়ার ইয়োরুবাদের প্রচলিত উপকথার এক সংকলন। তারপর ১৯৫২-তে প্রকাশিত হয়েছিল আমোস টুটোলার 'পাম ওয়াইন ড্রিংকার্ড' যেটিকে কবি ডন 'ভোরের পাখির সংগীত' বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অন্য ইউরোপীয় সমালোচকরা তুলোধোনা করেছিল। নাইজেরিয়ার লেখক টুটোলার এ বইকে নাইজেরীয় সাহিত্য সমালোচকরাও উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চাননি। আসলে এই বই স্থানীয় আবহমান মৌখিক-সাহিত্য বা প্রচলিত লোককথারই লিখিত বয়ান। এরকম নেশার রাজ্যে বিচরণের বৃত্তান্ত সাহিত্যে পরিচিত। আমরাও বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে পেয়েছি। কিন্তু আচেবের 'থিংস ফল অ্যাপার্ট' সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা বা যাকে পশ্চিমের সাহিত্যে নভেল বা উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়, তাই। এই প্রথম কোনো আফ্রিকার লেখক লেখার গুণেমানে যেকোনো সেরা ইউরোপীয় উপন্যাসের সমকক্ষ মর্যাদার আসন দাবি করল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর বিপুল সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা, আফ্রিকার পরবর্তী সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ অনেক সহজ করে দিল। সে যুগে মাত্র গুটিকয় প্রকাশকই এগিয়ে এসেছিল অনেক সাহস নিয়ে— ফেবর অ্যান্ড ফেবর, হাইনম্যান এবং ব্লুমসবুরি— তাঁদের কাউকেই আর পিছনে তাকাতে হয়নি। হাইনম্যান 'আফ্রিকান-রাইটার্স' সিরিজ বার করতে লাগল।

এটাও দেখার মতো— আত্মপ্রকাশের প্রায় মাত্র পঞ্চাশ বছরে আফ্রিকার নাইজেরিয়া, ঘানা, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে, উগান্ডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, প্রায় প্রতিটি দেশ থেকেই বেরোল এক গুচ্ছ বিশ্বমানের সাহিত্যনক্ষত্র। তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যকে শুধু আরো সম্পদশালী করলেন তাই নয় তাঁদের প্রাচীন মৌখিক-সাহিত্যের আদলে এক নতুন শৈলীও প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর সূত্রপাত করেছিলেন অবশ্যই চিনুআ আচেবে।

তাঁর 'থিংস ফল অ্যাপার্ট' বইটির নাম দিয়েছিলেন ইয়েটসের একটি কবিতার লাইন থেকে। এক প্রাচীন সভ্যতার সমাজ-সংস্কৃতি কীভাবে ভেঙে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর চক্রান্তে। কীভাবে খ্রিস্টধর্মও বণিকদের হাতিয়ার হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন এবং শোষণকে দৃঢ় করে— তার এক সফল রূপায়ণ দেখা গেল এতে।

চিনুয়া আচেবে যে সাড়া জাগালেন তা ছড়িয়ে গেল আশ্চর্য ঢেউয়ের মতো আফ্রিকার কোনায় কোনায় এবং খুব অল্প সময়ে। মনে করা যেতে পারে ক্ষেত্র এবং বীজ সবই তৈরি ছিল, অপেক্ষা ছিল একজন পথ-প্রদর্শকের। সে কাজ সম্পন্ন করলেন আচেবে।

আফ্রিকার প্রতিবাদী সাহিত্য আজ আর মাত্র কয়েক জনে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের এই আলোচনা লেখক চিনুয়া আচেবেকে নিয়ে।

তিনি নাইজিরীয়, ইবো জাতির লোক। 'থিংস ফল অ্যাপার্ট' এই বইটি আফ্রিকার কোনো লেখকের প্রথম সার্থক বিশ্বমানের উপন্যাস। এক প্রাচীন এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে আরেক যন্ত্র-কুশল সভ্যতার সুচতুর অনুপ্রবেশ এবং ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস। আচেবের শিক্ষাদীক্ষা সবই নাইজিরিয়ায়। মেধাবী ছাত্র তাই স্কলারশিপ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে কোনো অসুবিধা হয়নি। স্কুলে তিনি ছিলেন সেরা ছাত্র। তখন স্বাধীনতা আসন্ন। ইবাদানে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে ১৯২৯-এ। তিনি মেডিক্যাল পড়বেন বলে প্রবেশ-পরীক্ষা দিলেন। এত ভালো হল ফল উনি শুধু ভর্তি নয়, স্কলারশিপ পেলেন পড়ার খরচ চালাবার জন্যে। কিন্তু ওঁর দিক পরিবর্তিত হয়ে গেল।

স্কুলে থাকতে ওঁদের একদলকে পড়া থেকে সরিয়ে খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিষয়ে আকৃষ্ট করবার জন্যে হেডমাস্টারমশাই বিকেল ৫টা থেকে ৬টা অবধি পাঠ্যপুস্তক পড়া বা ওই সম্পর্কে লেখা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু খেলাধুলায় বা অন্য কিছুতেই মন ছিল না ওঁদের। পাঠ্যপুস্তক নিষিদ্ধ? ওঁরা বিশ্বসাহিত্য পড়তে শুরু করলেন। এই দলটিই পরবর্তীকালে স্বাধীন নাইজিরীয়া সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছিলেন। কিশোর বয়সে ইউরোপীয় লেখকদের লেখা বইতে আদিবাসী কালো মানুষদের যে অসভ্য-ক্রূর বর্বররূপে চিত্রিত দেখেছিলেন তাকেই সত্য রূপ, সাদা মানুষদের মহান, সাহসী ও বীরই ভাবতে শুরু করেছিলেন। মেডিকেল পড়তে পড়তে ওঁর মনে হল এতকাল যা পড়েছেন যা জেনেছেন তা ঠিক নয়। ওই কালো মানুষদের সম্পর্কে কিছুমাত্র না জেনে বা অতি সামান্য জেনে ওইভাবে তাদেরকে কুৎসিতরূপে আঁকা হয়েছে হীন উদ্দেশ্যে। এ সময়েই পড়লেন জন কেরির লেখা 'মিস্টার জনসন'। উনি উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ। ঠিক করে ফেললেন তিনি সমান্তরাল সাহিত্যসৃষ্টি করে দেখাবেন কালো মানুষদেরকে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এক ক্রূর চক্রান্তের শিকার হয়েছে তারা। নতুন করে লিখতে হবে এদেশের প্রকৃত ইতিহাস, ইউরোপীয়দের নৃশংস বর্বরতা, তাদের শঠতা এসব সারা বিশ্বমানের কাছে তুলে ধরতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ও শোষণের আসল ছবি। মেডিক্যাল ছেড়ে চলে এলেন সাহিত্যের ক্লাসে। লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এখন তাই হবে তার প্রধান পেশা। কিন্তু স্কলারশিপ ছিল মেডিক্যাল পড়ার জন্যে। তা বন্ধ হয়ে গেল। ওঁর দাদা ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। তিনি এগিয়ে এলেন ছোটোভাইয়ের সাহায্যে।

কিছুদিনের পরীক্ষায় আবারও সাফল্য আবার বৃত্তি পেয়ে গেলেন। শেষ পরীক্ষায় কিন্তু প্রথম শ্রেণি পেলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে একটু মনখারাপ হলেও বসে পড়লেন না। কিছুদিনেই যোগ দিলেন ১৯৩৩-এ নবগঠিত নাইজিরীয় বেতারকেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে। এখানে ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

সংবাদ সংগ্রহ, সংগৃহীত সংবাদের সম্পাদনা এই সাংবাদিকতার কাজে নিজের দেশকে আরো গভীরভাবে জানতে পারলেন। তার প্রতিফলন ঘটল তাঁর লেখায়। ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তাঁর প্রথম গল্প— 'এ ভিলেজ চার্চ'। তাতে তুলে ধরেছিলেন প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে খ্রিস্টীয় চার্চের সংঘাত এবং তার প্রভাব গ্রামের লোকজীবনে। এ গল্পে যে-রীতি তিনি অনুসরণ করেন তা পরবর্তী অনেক লেখায় ব্যবহার করেছেন, তাঁর নিজস্ব রীতি। তাঁর আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অন্যান্য ম্যাগাজিনে।

বেতারকেন্দ্র লাগোস, নাইজিরিয়ার রাজধানী শহরে। এখানে কাজের ফাঁকে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা। ১৯৫৭ সালে তা সম্পূর্ণ হলেও টাইপ করাতে নাজেহাল। প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে ওদের বেতারকেন্দ্রর ডিরেক্টর ইংরেজ ভদ্রমহিলার ব্যক্তি-উদ্যোগে সেটি টাইপ হয়ে এল এবং পুনরায় ওঁর পছন্দমতো সংশোধন ইত্যাদির পরে বিখ্যাত প্রকাশক হাইনম্যানকে রাজি করানো গেল সেটি ছাপাতে। অবশ্যই সেজন্যে তাদের অনুতাপ করতে হয়নি বরং এই কালো মানুষদের কলমে নবজাগ্রত আফ্রিকার সাহিত্য নিয়ে 'আফ্রিকান রাইটার্স সিরিজ' বার করতে লাগলেন। অবাক করার মতো বাণিজ্যিক সাফল্য দেখে। কিছুদিনেই তার প্রধান সম্পাদনার দায়িত্বও এসে পড়ল চিনুয়ার ওপর।

যেন স্লুইসগেটের দরজা খুলে গেল। একে একে বেরুতে লাগল, আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন একদল তরুণ লেখক-লেখিকা, বিশ্বমানের সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে।

চিনুয়ার প্রথম উপন্যাস 'থিংস ফল অ্যাপার্ট'-এর অসামান্য জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবীজুড়ে এর ব্যাপক প্রচারের কথা আগে বলা হয়েছে। এবং এই উপন্যাসের মাধ্যমে আফ্রিকা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যিকদের ও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী প্রচারমাধ্যমের কুপ্রচারের মূলে পড়ল প্রথম এবং কঠোর আঘাত। চিনুয়ার উদ্দেশ্য সফল হল। সক্ষম এবং সমান্তরাল সাহিত্য রচনা করেই জন কেরি বা এল্‌সপেথদের সাহিত্যের ছদ্মবেশে কালো মানুষদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের উপযুক্ত উত্তর দিলেন। একের পর আর লিখে চললেন 'নো লঙ্গার এ্যাট ইজ', 'গডস অ্যারো'র মতো উপন্যাস ত্রয়ী।

উপন্যাস ত্রয়ী

১। থিংস ফল অ্যাপার্ট: এই উপন্যাসটির শুরু একটি প্রাচীন সভ্যতার বাহক ইগবো বা ইবো জাতির গ্রাম— উমোফিয়াতে। এই মানুষেরা তাঁদের দেব-দেবী, পূর্বপুরুষদের আত্মা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি এসবের পুজো সন্তুষ্টিবিধান এবং তাঁদের নিজেদের আমোদপ্রমোদ সামাজিক অনুষ্ঠান এসব নিয়েই আছে। পশুপালন, চাষবাস ইত্যাদিতেই তারা সুখী পরিতৃপ্ত। তীব্র তাঁদের সম্মানবোধ। নায়ক 'ওকোনোকবা' মহাবলী কুস্তিগীর, সাহসী এবং সফল সম্পন্ন চাষি। কয়েকটি সামাজিক উপাধিও পেয়েছেন। গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ওকোনকোবার বাপ ছিল শিল্পরসিক। বাঁশি বাজাতে ভালোবাসত। ভালোবাসত নাচ-গান, নরম মনের মানুষ। এ ধরনের মানুষ সেই গ্রামীণ সমাজে অপদার্থ অলস এবং মেয়েলি বলে উপহাস ও বিদ্রুপের পাত্র। তিনি চাষে পরিশ্রম করতেন না তাই অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। জীবনের কোনো কিছুতে সফল হতে পারেননি। ওকোনকোবার অর্ন্তলীন ভয়— এই বুঝি সে বাপের মতো দুর্বলতা দেখাচ্ছে, দুর্বল হয়ে সমাজের উপহাসাস্পদ হয়ে গেল! তাই সবসময় চেষ্টা নিজেকে ঢেকে রাখা একটি কাঠিন্যের আবরণে। কোনোরকম হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ দেখাবে না। বরং যেন অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর এমনই মনে হবে।

এই গ্রামে এল খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকরা। ধর্মপ্রচার তাদের পেশা, উদ্দেশ্য এই ইবোদের অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের হাত থেকে উদ্ধার করে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান করে তোলা। এই যাজকদের রক্ষা করার জন্যে ইবোদের অজ্ঞাতসারে চলে এসেছে এই ধর্মযাজকদের দেশের সামরিক শক্তি। নিজেদের মতো করে শাসনব্যবস্থা, বিচারালয় সব সাজিয়ে নিয়েছে। ভাঙতে লাগল দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস, তাঁদের দেব-দেবীর অনুশাসন। ভাঙতে লাগল প্রাচীন সমাজব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায় ও বিচারব্যবস্থা। ইবোদের রাজা নেই, অধিপতি নেই, নেতা নেই। আছে নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষ যারা একত্রে বসে সব সমস্যা সংকট বিপদআপদের সমাধান খুঁজে সমাধান করে। সমষ্টির এই আদর্শ গণতন্ত্র, রাজভক্ত ইংরেজরা মানবে কেন। ওরা এই নেতৃস্থানীয়দের ধরে নিয়ে বন্দি করল, করল চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনা। মানি, সামাজিক অত উপাধিধারী ওকোনকোবা, মহাবীর ওকোনকোবা আত্মহত্যা করে অপমানের গ্লানির হাত থেকে মুক্তি নিল।

ভাঙন, যা শুরু হয়েছিল পবিত্র প্রাণিদের হত্যা দিয়ে বুঝি সম্পূর্ণ হল নায়কের আত্মহত্যায়। সম্পূর্ণ হল 'ফল অ্যাপার্ট'-এর কাহিনি।

নো লঙ্গার এ্যাট ইজ (প্রকাশ ১৯৬০)

১৯৫৮ সালে বেরিয়েছিল 'থিংস ফল অ্যাপার্ট'। দু-বছর পরে এল 'নো লঙ্গার এ্যাট ইজ'। পূর্বতন উপন্যাসের নায়কের পৌত্র

ওবি এই উপন্যাসের নায়ক। ওকোনকোবার বড়ো ছেলে নোইয়েকে তার বাপ ওকোনকোবা পাঠিয়েছিল মিশনারিদের স্কুলে সাদা মানুষদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্যে যাতে অজ্ঞতা থেকে তারা বিপন্ন না হয়। ফল হল বিপরীত। পুত্র খ্রিস্টান হল তাই নয়, নিজেদের সবকিছুকেই নিন্দনীয় এবং ত্যাজ্য জ্ঞান করল। তার পুত্র ওবি জন্মেই খ্রিস্টান, লাগোসের নাগরিক, লেখাপড়ায় মেধাবী। বৃত্তি নিয়ে বিদেশ গেল। বিলেতি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে যোগ দিল শিক্ষা বিভাগে। বিদেশে যাবার জন্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যে বৃত্তি দেয়া হয় তার নির্বাচনের কাজ তার। তখন নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা আসন্ন। সব গুরুত্বপূর্ণ পদে চেষ্টা হচ্ছে দেশীয় যোগ্য লোক বসানোর। ওবির এ কাজটা ছিল ইউরোপীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই বেতন ও পদমর্যাদায় সে এখন ইউরোপীয়দের সমকক্ষ।

ওবি তার পিতামহের মতোই আদর্শবাদী এবং সত্যবাদী। সে জানতে পারল তার কাজে প্রতিমুহূর্তে উৎকোচ এবং নানারকম প্রলোভনের সামনে পড়তে হবে। এবং সেসবের সে সাহসের সঙ্গেই মুখোমুখি হতে লাগল। শিক্ষা অধিকর্তা ইংরেজ তার ওপর বিশেষ প্রসন্ন। ওবি থাকছে ইউরোপীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকায় সবাই অভিজাত গণ্যমান্য সেখানে। কিন্তু তার কাছে তার পরিবারের, আত্মীয়স্বজন স্বজাতিদের অনেক প্রত্যাশা। সকলেই চায় তার সাহায্য, তার সহানুভূতি। সহানুভূতির অভাব না থাকলেও তার আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। সে বিয়ে করতে চাইছে এমন একটি মেয়েকে যে তার পরিবারের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আর্থিক চাহিদা ও সীমিত আয়ের টানা-পোড়েনে দীর্ণ হতে হতে একসময় সে বিদেশে শিক্ষার বৃত্তির এক আবেদনকারীর প্রলোভনে পা দিল এবং বিচারে পরে তাকে জেলে যেতে হল।

এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট শহর, লাগোসের নগরজীবন। এই নগর জীবনের দুর্নীতি প্রবণতা, তাদের সামাজিক ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের মূলকথা।

গডস অ্যারো (প্রকাশ ১৯৬৪)

চার বছর পরে বেরুল ত্রয়ীর তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস ‘গডস অ্যারো’। গ্রাম্যসমাজ সংস্কৃতি নিয়ে বোধহয় আর কিছু লেখেননি চিনুয়া। তাই গডস অ্যারোর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। নিশ্চয় উনি মনে করেছিলেন যা হারিয়েছে যা নষ্ট হয়েছে তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। উনি পুরোপুরি মন দিয়েছিলেন রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া টানা-পোড়েন এবং মারাত্মক দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টায়।

‘গডস অ্যারো’-তে নায়ক এজেউলু গ্রামদেবী ‘উলু’র উপাসক, গ্রামের প্রধান পুরোহিত। উলু ওই গ্রামের রক্ষয়িত্রী। সেই দেবী তার অনুজ্ঞা অনুশাসন বিধান সবই দিয়ে থাকে ওই প্রধান পুরোহিতের মাধ্যমে। তাই সে গ্রামে এজেউলু নেতৃস্থানীয়। তার যেমন যেমন স্বপ্নাদেশ হবে সমস্ত গ্রামবাসী সে অনুযায়ী চাষ শুরু, ফসল আহরণ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী জীবনের কর্তব্য পালন করে থাকে। এজেউলু জানে সে একজন বিশিষ্ট, দেবী উলুর বিশেষ দাক্ষিণ্য তার ওপর এবং সেই দায়িত্ব তার জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। এরকমই চলছিল সেই প্রাচীন ইবোদের গ্রাম। সেখানে এল মিশনারিরা। সে গ্রামের যারা কোনো সামাজিক অপরাধের দণ্ডভোগ করছে তাদেরকেই ডেকে নিল মিশনারিরা। প্রশ্ন করতে লাগল তাদের সকল বিশ্বাস নিয়ে। অবজ্ঞা করতে শেখাল তাদের সামাজিক অনুশাসনকে, এজেউলু প্রচারিত দেবীর অনুজ্ঞা। এবং তাদের যে কিছু হল না তাই এ সবই যে মিথ্যা সে-বোধ থেকে অশ্রদ্ধা জন্মাল স্বজাতি স্বধর্মের ওপর। এবং তাদের সহায়তায় শাসকদের পল্টন প্রশাসন বিচারব্যবস্থা তৈরি হল। ইবো-সমাজের ভেতরেই শুরু হল বিভিন্নতা, বিভেদ এবং বিদ্রোহ। এজেউলুর কারাবাস এবং জনসমক্ষে অপমান এবং গরিমার স্থান থেকে চিরদিনের জন্যে নির্বাসন। গ্রামবাসীরা মনে করলেন উলু দেব-দেবী রুষ্ট হয়ে তাদেরকে ত্যাগ করে বিধর্মীদের পক্ষে গেছেন। এটিও গ্রামীণ ধর্মবিশ্বাস ও খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং তাদের সহায়ক সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির সংঘাতেরই আরো একটি নিখুঁত ও সার্থক রূপায়ণ। যে ইতিহাস নতুন করে লেখার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন চিনুয়া, এ উপন্যাস সে প্রতিশ্রুতি পূরণে আরো একটি সংযোজন।

এই উপন্যাসটির, মার্কিন সাহিত্যিক জন আপডাইক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিনুয়াকে লিখেছিলেন ‘এ্যান এন্ডিং ফিউ ওয়েস্টার্ন নভেলিস্টস উড হ্যাভ কন্ট্রাইভ্ড।’

ম্যান অব দ্য পিপ্‌ল

১৯৬৪ সালে বেরিয়েছিল তাঁর ‘গডস অ্যারো’, দু-বছর পরেই বেরুল তাঁর ‘এ ম্যান অব দ্য পিপ্‌ল’। সদ্য স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলিতে গণতন্ত্রের হত্যা কীভাবে হয়ে চলেছে তারই এক উন্মোচন।

‘নাঙ্গা’ ক্ষমতাসীন দলের এক মন্ত্রী। তার গ্রামের একটি তরুণ যে নাকি একসময় মন্ত্রী যে স্কুলে পড়িয়েছে সেখানেই শিক্ষকতা করছে, তাকে টেনে নেয় যেন দাক্ষিণ্যে। তরুণ ওডিলি চলে আসে শহরে মন্ত্রীর আশ্রয়ে। সে শহরেই তার প্রেমিকা। তার প্রেমিকাকে দেখে মন্ত্রীও আকৃষ্ট। মন্ত্রীর আসল রূপ ওডিলির কাছে ধরা পড়ে। বর্তমান শাসকদলের স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও উৎখাতের জন্যে গঠিত এক বিপ্লবীদলে ওডিলি যোগ দেয়। নির্বাচনে মন্ত্রীর

বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ওডিলি। কিন্তু নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয় এবং বিপুল ভোটে হেরেও যায়। অপশাসন দুর্নীতি ও কায়েমি আসনে অধিষ্ঠিতই থাকে। কিন্তু সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সবাইকে উচ্ছেদ করে।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বইটি চারিদিকে আলোড়ন তোলে। ওঁর এক বন্ধু লিখলেন, 'তুমি চিনুয়া জানি প্রফেট, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। এ বইতে যা লিখেছ তার ওই সেনা অভ্যুত্থানটুকু বাদে আর সবই তো হয়েছে।' দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই শেষটুকুর জন্যেই তখন চলছিল তোড়জোড়। সেনানায়করা ভাবলেন তাদের গুপ্ত খবর নিশ্চয় চিনুয়া জেনে গেছে। তখনই পরিকল্পনা হল চিনুয়াকে শেষ করার। সে খবর কী করে চিনুয়া অনুমান করেছিলেন। স্ত্রী-সন্তানদের জলপথে একটা ভাঙাচোরা জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন হারকুর বন্দরে ইবো-গরিষ্ঠ এলাকায়। তাঁরা নিরাপদে পৌঁছোলেন, কিন্তু স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। চিনুয়া পালিয়ে এলেন পরিবারের কাছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করল।

'বায়াফ্রা' রাষ্ট্রের জন্ম

নাইজিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় ইবোরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মোট জনসংখ্যার বড়ো অংশটাই ইয়োরুবাইরাই বার বার ক্ষমতা দখল করছে। ফলশ্রুতি ইবোদের বঞ্চনা। স্বাধীনোত্তর নাইজিরিয়াতে এ নিয়ে জমা হচ্ছিল ক্ষোভ আর বিদ্বেষ। 'আ ম্যান অব দ্য পিপ্‌ল' বেরুল ১৯৬৬ সালে। পরের বছর ১৯৬৭ সালেই পূর্ব-দক্ষিণের ইবো এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নাইজিরিয়া থেকে, ঘোষণা করল নতুন রাষ্ট্র 'বায়াফ্রা'র যার অন্যতম স্থপতি চিনুয়া আচেবে। তাঁকেই করা হল তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী।

কিন্তু কর্পোরেটদের স্বার্থ তো ইয়োরুবাদের হাতে। প্রাকৃতিক ধনসম্পদ, তেল খনি, সোনা জহরত সবই ওদের এলাকায়। তাই বায়াফ্রার ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। সারা পৃথিবী ঘুরলেন চিনুয়া আচেবে। কোনো দেশের সামরিক সাহায্য এল না। অনেকেই তাঁকে সমর্থন করলেও, বায়াফ্রা টেকানো গেল না। বিদেশি সামরিকশক্তিতে সমৃদ্ধ ইয়োরুবা বাহিনী দশ বছরের শেষে দখল করল বায়াফ্রা। চিনুয়ার শিক্ষক, নোবেলবিজয়ী উবোলে সোইঙ্কা, চিনুয়াদের দাবি সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করায় সেনানায়কদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে গেলেন। ওঁকেও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল।

ঠিক একুশ বছর পরে বেরুলো চিনুয়ার শেষ উপন্যাস 'অ্যান্টাহিল্‌জ অব সাভানা'। তখন তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। হতাশ, পর্যুদস্ত ক্লান্ত এই অমর কথাশিল্পী বুঝে নিয়েছেন পশ্চিমি শোষণ থেকে স্বদেশকে আর মুক্ত করতে পারবেন না। লিখলেন আরো এক উন্মোচন— এই উপন্যাস।

'অ্যান্টহিল্‌জ অব সাভানা'

এটিও রাজনৈতিক এক পালাবদলের কাহিনি। স্বৈরতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য এবং শেষকথা যে বিদেশি বণিকরাই বলে তারই বাস্তবচিত্র। এক স্বৈরতান্ত্রিক নায়ক, 'হিজ এক্সেলেন্সি' বন্ধুদের মধ্যে 'স্যাম', সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে ছিল। স্যান্ডহার্স্ট থেকে বেরিয়ে সেনানায়ক। ক্ষমতা দখলের এক লড়াইতে এখন সে সরকারের প্রধান বা রাষ্ট্রপতি। তার সহপাঠী ক্রিস্টোফার ওরিকোকে করেছে তথ্য জনসংযোগ বিভাগের প্রধান কমিশনার এবং আরেক কবিবন্ধু আইকেম ওসোদিকে সরকারি মুখপত্র 'ন্যাশনাল হেরাল্ডের' সম্পাদক। এই নায়ক ঘনিষ্ঠ দলে আরেক জন বিয়াত্রিস অর্থ বিভাগে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। বিয়াত্রিস গল্পের নায়ক ওরিকোর 'গার্ল ফ্রেন্ড' এবং কবি ওসোদিরও বন্ধু। একটি মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্য সংস্থার বিদেশি প্রতিনিধিকেও এই উপন্যাসে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তিনি অবশ্যই রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ।

স্যামঘনিষ্ঠ ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পাদক ওসোদির মুখেই প্রথম শোনা যায় স্যামের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদ। তিনি কবি, অকুতোভয়। সাবধানবাণী সত্ত্বেও অবস্থানের পরিবর্তন করে না। অতএব অপসৃত এবং লাঞ্ছিত। দেশের খরাপীড়িত অঞ্চল নিয়ে ওসোদির অপসারণ, সে সম্পর্কে অনুরোধ করায় কমিশনার ও রাষ্ট্রপতির সন্দেহভাজন। উনি ওই অঞ্চল নিয়ে এদের আগ্রহকেই পছন্দ করছেন না। ওরিকো খবর পেলেন যেকোনো মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, অতএব একজন সাধারণের মতো তিনি রাজধানী ত্যাগ করে চললেন বাসে বহুদূর উত্তরাঞ্চলে যেখানে রাষ্ট্রপতির প্রভাব নেই। কিন্তু পৌঁছোতে পারলেন না। তখন রাজধানীর বাইরে উচ্ছৃঙ্খল সেনারা বাস থামিয়ে লুঠতরাজ নারীধর্ষণ করে যাচ্ছে। তেমনি একটি অসহায় মেয়েকে এক মত্ত সৈনিকের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হলেন ওরিকো। ততক্ষণে রাজধানীতে শুরু হয়ে গেছে আরেক সেনা অভ্যুত্থান।

উপন্যাস হিসেবে এটি বহু কারণেই বিশ্বসাহিত্যের একটি দিকচিহ্ন। একই কাহিনিতে বিভিন্ন ধরনের কথ্যভাষার আশ্চর্য প্রয়োগ। কখনো ইংরেজি 'পিজিন' (নিজেদের বুলি-মেশানো ইংরেজি) কাজ চালাবার ভাষা, কখনো ঔপনিবেশিক ইংরেজি কখনো বিশুদ্ধ ভদ্র ইংরেজি এবং প্রতিটি প্রয়োগ সুষ্ঠু ও উপযোগিতায় অনন্য। তেমনি তৈরি করেছেন ধাপে ধাপে এক রহস্য কাহিনি সুলভ 'সাসপেন্স'। তেমনি বিশিষ্ট নাটকীয়তায়। অভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশের পরিস্থিতি যা আরেক অভ্যুত্থানের জন্ম দিচ্ছে। এর নাটকীয় ভাঙা-গড়া পালাবদলের চালচিত্র উপন্যাসটিকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আচেবে বুঝতে পেরেছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা শাসকের পরিবর্তনে মূল

শোষণব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসছে না। এ বই বিশ্বের সাহিত্যরসিক সমালোচক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। হয়তো কথাশিল্পের নিদর্শন হিসেবে এটিকে চিনুয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা উচিত। বইটি নিঃসন্দেহে সদ্য স্বাধীন আফ্রিকার নবজাগ্রত সাহিত্যমানসে প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছে। নায়কতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং বৈপরীত্য তুলে ধরে পরবর্তীদের প্রতিবাদের ভাষা আরো তীব্র তীক্ষ্ণ করেছে এবং আক্রমণের লক্ষ্য নির্দেশ করেছে। তাই চিনুয়া আফ্রিকার নবজাগ্রত সাহিত্যসাধকদের দিশারী, পথিকৃৎ।

ওঁর শেষ বই 'হোম এ্যান্ড একজাইলে' নিজেকে উন্মোচিত করেছেন চিনুয়া আচেবে। এ বইতে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট, তাঁর জীবনী। এবং আমরা বুঝতে পারি কী যন্ত্রণা বুকে নিয়ে উনি কলম ধরেছিলেন। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী বা শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপকের বৃত্তিতে সন্তুষ্ট না থেকে।

ওঁর পথেই ওই হাইনম্যান থেকে আফ্রিকান রাইটার্স সিরিজে একে একে বই বেরুতে থাকে। আত্মপ্রকাশ করে ঘানায় আমা-আটা-আইডুর 'আওয়ার সিসটার কিলজয়', নাইজিরিয়ায় বুচি এমেচিতার 'দ্য জয়জ অব মাদারহুড'। দুই শক্তিশালী মহিলা কথাশিল্পী। কেনিয়ায় ঙ্গুইগির 'উইপ নট চাইল্ড', 'পেটালস অব ব্লাড' এবং 'ডেভিল অন দ্য ক্রস' প্রতিটি বই নবজাগ্রত মুক্তচিন্তা এই শোষণ শাসনের এক-একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। এক শক্তিমান উত্তরসূরি এই ঙ্গুইগি। তেমনই স্বাঙ্গির 'উইপেন অব হাঙ্গার'। সবই প্রায় স্বেতাঙ্গ শাসকদের রচিত ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং স্বাধীনোত্তর দেশের অন্তঃকলহ, উচ্চমাধ্যমিক যাদের হাতে প্রশাসনের দায়দায়িত্ব তাদের দুর্নীতিপ্রবণতা এবং নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবীদের অসহায়তার এক-একটি অসাধারণ উন্মোচন।

কেনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন 'মাউ মাউ', যার অর্থ নাকি 'ভাগো ভাগো'। এর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে এঁদের সমর্থন সংযোগ থাকলেও তা পরে মোহভঙ্গের কারণ হয়ে ওঠে। মাউ-মাউ নিছকই সন্ত্রাস, অনেক সময় লোভী ব্যক্তি-স্বার্থে লিপ্ত, বৃহত্তর গণআন্দোলনে আগ্রহী ছিল না। তাই এই সাহিত্যিক আন্দোলনের দিকে তারা ফিরে তাকায়নি।

একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া কোথাও এই গণতন্ত্রপ্রেমী প্রতিবাদী সাহিত্যিকদের লড়াই তেমন সাফল্য পায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা স্বীকার করেছেন চিনুয়ার কাছ থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা, পেয়েছেন শেকল ভাঙার সাহস।

কেনিয়ার নারীবাদী লেখিকা সনাতা স্বাধীনোত্তর দেশীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং তীব্র আক্রমণ করেছেন সমকালীন সমাজে একচেটিয়া পুরুষতন্ত্র এবং নারীদের অবমাননা। চিনুয়া নারীবাদের পাশ্চাত্য আন্দোলনকে হয়তো সমর্থন করেননি কিন্তু তিনি বর্তমান আধুনিকতায় নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও রাষ্ট্রের বঞ্চনাকে তুলে ধরেছেন এবং প্রাপ্যটুকু পেতেও যে নারীকে আত্মঅবমাননা সইতে হয় তাও স্পষ্ট করেছেন 'নো লঙ্গার অ্যাট ইজ' বা 'এ্যান্টহিলজ অব্ সাভানা'য়। এবং প্রাচীন সমাজে প্রচণ্ড পুরুষ-আধিপত্যের পাশাপাশি নারীদের বিশেষ অধিকারগুলো তুলে ধরেছিলেন। সেদিক থেকেও চিনুয়া আমা-আটা-আইডু, বুচি এমেচিতা বা সনাতা এদের পথিকৃৎ, পূর্বসূরি। এই সূত্রেই বলা যেতে পারে আফ্রিকার আরো কোনো কোনো লেখকও তাঁদের সৃষ্টির কথা।

বেন ওকরি (নাইজেরিয়া ১৯৫৯)

ওঁর গল্পে উপন্যাসে বাস্তব আর মায়াজগৎ পাশাপাশি হাত ধরে চলে, কখনো মিশে যায়। এই মিশ্র জগতের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বাস্তবের নির্মম কঠিনতা। বাস্তবের জগতে অসহায় শোষিত মানুষেরা অত্যাচারিত হতে হতে একসময় সংঘবদ্ধ হয় প্রতিবাদে গর্জন করে, মার খায়। আন্দোলন দানা বাঁধে। কখনো অত্যাচারীরাও দিশা হারায়। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানবসত্তা মাথা তোলে, মুক্ত হাওয়ার স্বাদ চায়। ওঁর লেখায় এক সামন্তরিক মায়াজগতে বাস্তব আর যাদুবাস্তবে মিশে অনবদ্য সাহিত্য হয়ে ওঠে। তেমনি তীব্র হয় অত্যাচারিতের প্রতিবাদ।

ইনি বুকার পেয়েছিলেন, যে বুকারের জন্যে শেষ বাছাইয়ের তালিকায় এসেও আচেবে বাতিল হয়েছেন এবং তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ৎসিত দানগারেম্বা (জিম্বাবোয়ে ১৯৮৮)

বোধহয় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা যিনি প্রথম উপন্যাসেই আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ওর 'নার্ভাস কন্ডিশান' তেমনি এক উপন্যাস। বহু আলোচিত এবং পঠিত। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সে বিখ্যাত কথা 'একখানা ঘর আর মাসে পাঁচশো পাউন্ড, এই হলেই একজন লেখিকার লেখা চালিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট, এরই প্রতিধ্বনি করে উনি বলেছিলেন 'নার্ভাস কন্ডিশান'-এর রয়্যালটি দিয়েই আমি নিজের জন্য একখানা ঘর কিনতে পেরেছি যদিও এই পাঁচশো পাউন্ডের ব্যাপারটায় আমি অতটা সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। ওর পরে মাত্র আরেকখানা উপন্যাস লিখেছেন সেটিও ওই প্রথমটিরই পরবর্তী অংশ। আর উপন্যাস লেখেননি। শুরু করেছিলেন কবিতায়, চলে যান চলচ্চিত্র জগতে এবং সেখানেই ছিলেন, মাঝে তাঁর এই উপন্যাস। তাই চলচ্চিত্রের টেকনিকের প্রভাব এ বইতে স্পষ্ট।

আয়ি ক্বোই আরমা (ঘানা ১৯৩৯)

ওঁর তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও পঠিত হিসেবে প্রথমেই না আসে 'দ্য বিউটিফুল ওয়ানজ আর নট ইয়েট বর্ন'। ঘানার প্রথম নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক নক্রুমা সরকারের পতনের পর হতাশা ও সেনানায়কয়ের কুশাসন ও দুর্নীতির প্রতিবাদের এক অনন্য দলিল এই উপন্যাস। এর বৈশিষ্ট্য অনেক কিছুতেই। এর বাচনভঙ্গি আফ্রিকার নিজস্ব কথকতার ধরনে, নায়ক এবং অন্যান্য চরিত্রে নামহীনতা বা প্রতীকী উচ্চারণ এবং সবকিছুতে ইমেজারির ব্যাপক প্রয়োগ। নায়কের নাম 'একটি মানুষ'। তিনি অনুসন্ধিৎসু এক কেরানি আর অপর চরিত্রের নাম শুধুই 'শিক্ষক'। স্থান একটি ঝাঁ-চকচকে হোটেল। আর আছে একটি সিঁড়ি যা অসংখ্য বার রং করেও তার ফাটা চিহ্নগুলো কিছুতেই ঢেকে ফেলা যায় না।

ইতিহাসের দাবি মেনে শিল্পকে বারে বারেই গজদন্তমিনার ছেড়ে লোকশিল্প বা 'ফোকে'র দরজায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। আচেবে বা তাঁর অনুবর্তীরাও তার ব্যাতিক্রম নন। এই ধারাকে অবলম্বনের ফলেই হয়তো নব্য ইওরোপীয় 'পোস্টমডার্নিজম' বা লাতিন আমেরিকার 'ম্যাজিক রিয়ালিজমে'র সন্ধান পেয়ে যায় আজকের আফ্রিকান সাহিত্য।

অন্য এক রেনেসাঁস

অনুরাধা রায়

আমরা স্কুল-কলেজের ইতিহাসে ভারত ছাড়াও প্রাচীন গ্রিস-রোম, বাইজানটাইন সভ্যতা, টিউটর-স্টুয়ার্ট ইংল্যান্ড, মধ্যযুগের ইউরোপ, রেনেসাঁস থেকে ফরাসি বিপ্লব পেরিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধ হয়ে আধুনিক ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি অনেক কিছু পড়েছি, কিন্তু জরুরি অনেক বিষয় বাদও থেকে গেছে। তার একটা বড়ো কারণ আমাদের ইতিহাসচর্চার পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিকতা, যা কিনা 'আধুনিকতার'-র মতাদর্শ-প্রভাবিত এবং কিছুটা আমাদের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারও বটে। ডা. সুমিতা দাস পেশায় ইতিহাসবিদ নন, কিন্তু ঐতিহাসিকদের অনবধান সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি ইতিপূর্বে লিখেছেন কলম্বাস-পূর্ব দুই আমেরিকার সভ্যতা ও উত্তর-কলম্বাস পর্বে ইউরোপ থেকে আসা দস্যুদের হাতে তাদের লুণ্ঠনের ইতিহাস। আর তাঁর নতুন বইটিও এমন একটি বিষয়ে আলোকপাত করল যা ইতিহাসের ছাত্রদের তো বটেই, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরও জানা উচিত, কিন্তু তেমনভাবে জেনে ওঠা হয়নি। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও পরে) মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনজুড়ে যে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল— মুসলমান শাসকদের আওতায়, অনেকটা ইসলাম-ধর্মীয় মানুষদেরই হাতে, যদিও সেখানে অন্য ধর্মের মানুষদের, যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান ও জরাথুস্ট্রীয় পারসিকদেরও অংশগ্রহণ ছিল, এবং যে সভ্যতার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল আরবি (সরকারি কাজকর্মের ভাষা ও কোরানের ভাষা হিসেবে মান্যতা পেয়ে)— সুমিতার বইটি তা নিয়েই। শাসক, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন ও ভাষাগত বন্ধনের পরিচয়ে তিনি তাকে আরবি-ইসলামীয় সভ্যতা বলেছেন বটে, কিন্তু এটাও তিনি দেখিয়েছেন যে এই সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞান বিকাশের ইতিহাসটা কোনো বিশেষ ধর্ম বা ভাষার পরিধি ছাপিয়ে মানবপ্রজাতির অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিভার বৃহত্তর ও গভীরতর এক জায়গা থেকে উৎসারিত।

আলোচিত সভ্যতার পটভূমি রচনা করেছিল সপ্তম শতকে হজরত মহম্মদের জীবৎকাল থেকে শ-খানেক বছরের মধ্যে উম্মাইদ খলিফাদের হাতে বিরাট সাম্রাজ্যের বিস্তার। তারপর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে আব্বাসিদ খলিফাদের আনুকূল্যে এল জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ— তাঁদের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী বাগদাদকে কেন্দ্র করে, বাণিজ্য ও কৃষির বিকাশের ওপর ভিত্তি করে। গড়ে উঠল বিরাট এক অনুবাদ আন্দোলন। আরবি ভাষায় সুপ্রচুর অনুবাদ— গ্রিক, পারসিক ও সংস্কৃত থেকে। সেটা জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে আরবির নিজেকে প্রস্তুত করার তাগিদে, ইতিমধ্যেই বিকশিত মানবপ্রজ্ঞার ঐতিহ্যের সবটারই উত্তরাধিকার দাবি করার জন্য। বিষয়ের দিক থেকে বহুব্যাপ্ত এই আন্দোলন— গণিত (রাজকার্য, সম্পদবণ্টন, প্রাসাদ নির্মাণ বা সেচখাল কাটানোর পাশাপাশি প্রার্থনার জন্য কাবার অবস্থান নির্ণয়, প্রার্থনার সময় নির্ধারণ, এমনকী জ্যোতিষচর্চার প্রয়োজনেও), যুক্তিশাস্ত্র (কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা খ্রিস্টান বা ইহুদি পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে তর্ক করার তাগিদেও), চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবার দর্শন, সাহিত্য। কখনো হয়তো সরাসরি অনুবাদ নয়— গ্রিক থেকে সিরিয়ান বা প্রাচীন আরমাইক ভাষায়, তারপর সেখান থেকে আরবিতে। ভারতের অনেক বই সাসানিদ আমলেই পারসিক বা পহ্লবিতে অনূদিত হয়েছিল, এবার সেগুলির আরবি অনুবাদের পালা। অনুবাদ করার মতো তেমন তেমন ভালো বইয়ের সন্ধান দিলে নাকি সমপরিমাণ সোনা মিলত। সুমিতা ঠিকই বলেছেন— 'এই আমলে যদি শুধু এতটুকুই করা হত (অর্থাৎ শুধু অনুবাদ)... তার জন্যই আরবি-ইসলামীয় সভ্যতা মানবজাতির ধন্যবাদার্হ হত। কিন্তু তাঁরা শুধু তা করেননি, এই জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করেছেন, সমালোচনা করেছেন, ভুল খুঁজে বের করেছেন, এবং নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধানে যাত্রা করেছেন।' ইসলামের সেই কৈশোরে ধর্মীয় গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। কোনো কোনো ধর্মতাত্ত্বিক যদি বা মনে করতেন যে কোরানে যা নেই তা জানার মতো কিছু নয়, অনেকেই কিন্তু ইসলামের ব্যাখ্যা দেন এইভাবে— যেহেতু এই দুনিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টি, দুনিয়াটাকে জানা মানে তো ঈশ্বরকেই জানা। দার্শনিক

আল-কান্দি ঘোষণা করেন— সত্যের সন্ধানে 'বিদেশি বিজ্ঞানের' দ্বারস্থ হওয়ার লজ্জার কিছু নেই। এই যুক্তিবাদী চিন্তারই সমর্থক ছিলেন অষ্টম-নবম শতকের খলিফা হারুন-আল-রশিদ ও তাঁর পুত্র আল-মামুন (যিনি নাকি অ্যারিস্টটলকে স্বপ্নে দেখে জ্ঞানচর্চার প্রেরণা পেয়েছিলেন)। আল-মামুনের সময়ে খুব প্রভাবশালী ছিল ধর্মতত্ত্বের মুতাজিলা ধারা, যা ঈশ্বর ছাড়া আর সবকিছুকেই (এমনকী কোরানকেও) প্রশ্ন করতে, যুক্তি দিয়ে বুঝতে উৎসাহ দিত। আর আল-মামুনেরই আমলে বাইত আল-হিকমা বা জ্ঞান ভবনকে কেন্দ্র করে আসে অনুবাদ আন্দোলনের জোয়ার। বাগদাদের এই বাইত আল-হিকমা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দামাস্কাস, কায়রো বা করদোবার মতো শহরে বড়ো বড়ো গ্রন্থাগার, মাদ্রাসা (কলেজ), মজলিশ (জ্ঞানীগুণীদের আলোচনার কেন্দ্র), বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন দশম শতকে কায়রোয় ইসলামীয় শিক্ষার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান আল-আজহার), যে প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মশিক্ষার ওপর জোর দিলেও ধর্মবহির্ভূত বিষয় নিয়েও চর্চা করত। নবম-দশম শতক থেকেই আব্বাসিদদের একচ্ছত্র আধিপত্য চলে গিয়ে একেক জায়গায় একেক শাসক আসেন, তবু জ্ঞানচর্চার এই গৌরবময় ধারাটি অল্পবিস্তর টিকে ছিল পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত। স্পেনের ইসলামীয় রাজত্ব আল-আন্দালুসিয়ায় একাদশ শতক পর্যন্ত উম্মাইদ শাসনের পরে আসেন অন্য শাসকরা, তাঁদের আমলেও ঋদ্ধ হতে থাকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির জগৎ। সেই প্রক্রিয়া চলে ১৪৯২ সালে খ্রিস্টধর্মীয়দের দ্বারা স্পেনের শেষ ইসলামীয় রাজ্য গ্রানাডা দখল পর্যন্ত।

অনুবাদ আন্দোলনের কথা বলে নিয়ে সুমিতা একটির পর একটি অধ্যায়ে আরবি-ইসলামীয় সভ্যতায় গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেক আগ্রহোদ্দীপক প্রসঙ্গ এনেছেন আর নিজের মজবুত বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োগে পরিচ্ছন্নভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবকিছুই— ভারতের দশমিক প্রথার আরবে পৌঁছোনো; আল-খোয়ারিজমির বীজগণিত আবিষ্কার; আলোকবিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইবন আল-হায়থামের হাতে ইউক্লিড-টলেমির যুক্তির খণ্ডন, আর আলো যে সরলরেখায় চলে সেটা দেখানোর জন্য তাঁর পিনহোল ক্যামেরা (সুমিতা এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞান নিয়ে গ্রিক দার্শনিকদের বিমূর্ত চিন্তার জায়গায় হাতেকলমে পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর জোর দেন ইসলামীয় সভ্যতার পণ্ডিতরা, এইভাবে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যান); জ্যোতিষের হাত ধরে একদা ব্যাবিলনে যে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চা হয়েছিল তার উত্তরাধিকার বহন (জ্যোতিষকে বাদ দিয়ে নয় অবশ্য, যদিও ইসলাম ধর্মে জ্যোতিষচর্চার স্থান নেই); মানমন্দির নির্মাণ; আল-রাজি ও ইবন সিনার (আভিসেনা) চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা এবং হিপক্রেটিস-গ্যালেনকে ছাপিয়ে নিজস্ব অবদান রাখা; আল-রাজির বিখ্যাত *কিতাব আল-হাওয়ি* (*দ্য কম্প্রিহেন্সিভ বুক অফ মেডিসিন*); ইবন সিনার সুবিশাল *ক্যানন অফ মেডিসিন*, আর আজকের দিনে চিকিৎসার নৈতিক-মানবিক দিক নিয়ে আমাদের প্রবল উদ্‌বেগের পরিপ্রেক্ষিতে খুব উল্লেখযোগ্য আল-রাজির *যেখানে চিকিৎসক নেই* বইটি যা উৎসর্গীকৃত গরিব মানুষ, পথিক ও সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে, যারা চিকিৎসক না পেলে বইটির সাহায্যে নিজেরাই সাধারণ অসুখের চিকিৎসা করতে পারবে বলে লেখক আশা করেছিলেন; প্রাসঙ্গিক ভুয়ো ডাক্তারদের সম্পর্কে আল-রাজির সাবধানবাণীও; এছাড়াও বিমারিস্তান তথা হাসপাতাল নির্মাণ; স্থাপত্যের উৎকর্ষসাধন; জলশক্তি চালিত কলকারখানা; হরেক রকম যন্ত্রপাতি; লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির হেলিকপ্টারের ছবি আঁকার ছ-শো বছর আগেই আব্বাস ইবন-ফিরনাসের পাহাড় থেকে উড়ে নীচে নামার সফল এক্সপেরিমেন্ট; মূলত চিকিৎসক বলে পরিচিত আল-রাজির খনিজ তেল থেকে ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে কেরোসিন নিষ্কাশন; আলকেমি অর্থাৎ সোনা তৈরির চেষ্টার মধ্যে বীজ হিসেবে জন্ম নিয়ে রসায়নের স্ফূরণ; আবার শুধু সোনা নয়, জাবির ইয়ান হায়ানের রসায়নগারে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টা; সুমিতা এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানে অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের নামই এসেছে আরবি ভাষা থেকে (আলকোহল, আলকালি, আমালগাম, বোরাক্স, ক্যাম্ফর, এলিক্সির, বেঞ্জোইক)। আর এই এত এত জ্ঞানচর্চা তথা বইয়ের জন্য যে কাগজের প্রয়োজন তার প্রযুক্তি তো অবশ্যই আহৃত চিনাদের কাছ থেকে; বইয়ের জন্য কালি, আঠা ইত্যাদিরও প্রযুক্তিগত বিকাশ। সারা পৃথিবীর উন্নততম জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত ও আত্মস্থ করা, সংশ্লেষ ঘটানো, সবমিলিয়ে তাকে এক মুক্তমনা আন্তর্জাতিক চরিত্র দেওয়া— কয়েক শতাব্দীব্যাপী সেই মহাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত ও সুলিখিত আখ্যান এভাবেই পরিবেশন করেছেন সুমিতা দাস।

সুমিতার বইটির ঝোঁক বিজ্ঞানের দিকেই; তবে অল্প করে দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতির কথাও এসেছে। এসেছে দর্শনের চর্চায় প্লেটো ও আরিস্টটলের প্রভাব, এসেছেন সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির জনক বলে পরিচিত এবং হিস্টরিওগ্রাফিরও (ইতিহাস-রচনা) আদি-আলোচক ইবন খলদুন, আর এসেছেন আল-বিরুণী— 'একটি-দুটি বিদ্যার আধারে ধরেন না যে মনীষা'। দশম শতকে উজবেকিস্তানে জাত আল-বিরুনিকে আমরা ভারতীয়রা চিনি *কিতাব-আল-হিন্দ*-এর জন্যে। গজনীর মামুদের সঙ্গে ভারতে এসে তিনি এদেশ সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে যান। কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয়। আভিসেনার সঙ্গে তর্ক করেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত ধারণা

নিয়ে (কেপলারের ৬০০ বছর আগে প্রশ্ন করেছেন— গ্রহনক্ষত্রের গতিপথ শুধু বৃত্তাকার হবে, নাকি উপবৃত্তাকারও হতে পারে)। খনিজ পদার্থ, ভূতত্ত্ব, আরো অনেক ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রাখেন। ভূগোল প্রসঙ্গে সুমিতা বলেছেন টলেমির ভৌগোলিক ধারণার ভুল সংশোধন প্রচেষ্টা এবং দুই বিখ্যাত পর্যটকের এই বিষয়ে অবদানের কথা— দ্বাদশ শতকে স্পেনের আন্দালুসিয়ায় জাত আল-ইদরিস ও চতুর্দশ শতকে মরক্কোজাত ইবন বতুতা। শিল্পসাহিত্যের কথা সুমিতা খুব বেশি বলেননি। কিন্তু ছুঁয়ে গেছেন কিছু বিখ্যাত কবিকে— পারস্যের ফিরদৌসী, ওমর খৈয়াম, রুমী, সাদি, হাফিজদের (তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে শুধু আরবি নয়, ইসলামি জাহানের সংস্কৃতিচর্চায় ফারসিও বিরাট জায়গা করে নিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যে)। স্থাপত্যের কথাও সামান্য হলেও এসেছে।

ইসলামীয় সভ্যতার প্রতিতুলনায় বইটিতে বারে বারেই এসেছে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কথা, যেখান থেকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনা বলে ধরা হয়, যে সভ্যতাকে সামগ্রিকভাবে সভ্যতার মানদণ্ড বলেই ধরে নিয়েছে অনেকে। সুমিতা এই ইসলামীয় সভ্যতাকেও রেনেসাঁসই বলেছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রেরণা যেমন ছিল প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ, তেমনি এক্ষেত্রে গ্রিক ছাড়াও ভারতীয়, পারসিক ও চৈনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের। এক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। আর জোর দিয়ে সুমিতা বলেছেন এই পূর্ববর্তী ইসলামীয় রেনেসাঁসের কাছে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ঋণের কথা। বস্তুত প্রাক-রেনেসাঁস পর্ব থেকেই ইউরোপ যে আরবি-ইসলামীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংযোগে এসে ঋদ্ধ হচ্ছিল (সংযোগের বড়ো মাধ্যম— বেশ অনেকদিন ধরে ইসলামীয় শাসনের আয়ত্তাধীন ও পরে খ্রিস্টানদের হাতে পুনরুদ্ধার হওয়া স্পেন ও সিসিলি, তা ছাড়াও ক্রুসেড নামে খ্যাত যুদ্ধযাত্রাগুলি। তারপর তো ১৪৫৩ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল তথা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন। এটা আমরা স্কুল থেকেই পড়ে আসি যে, পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে হাজার বছর ধরে ইউরোপে বহাল ছিল অন্ধকার যুগ, তারপর পুনর্জাগরণ ঘটল যখন কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর সেখান থেকে পণ্ডিতরা গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বস্তা বস্তা আরবি অনুবাদ নিয়ে ইউরোপে চলে এলেন। এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না— খামোখা আরবরা গ্রিক থেকে এত আরবি অনুবাদ করেছিল কেন, বইগুলো দিয়ে করলই-বা কী! ইউরোপের সম্পদের নিছক অছি হিসেবে তাদের দেখিয়ে, জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে তাদের নিজস্ব অবদানকে আমরা এইভাবে অস্বীকার করি। যেখানে বিদ্যায়তনিক স্তরেও সে ইতিহাস তেমনভাবে আজও সংশোধিত হয়নি, সুমিতা সাধারণ্যের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সহজপাঠ্য ছোটো বইটি লিখে আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

বইটি পড়তে পড়তে আরো মনে হয় যে, সেই মধ্যযুগে মধ্যবিশ্বে বিকশিত আলোচ্য সভ্যতা মানবেতিহাসে এক অসাধারণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বটে! সব ভৌগোলিক সীমানা ও জাতধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক বহুমাত্রিক, উন্মুক্ত, আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ জ্ঞান ও কর্মের সাধনারত পৃথিবীর সম্ভাবনা। পৃ. ৭৪-এ বর্ণিত আল-জাজারি নির্মিত হাতি-ঘড়ি (আসলে জলঘড়ি) যেন তারই প্রতীক। সুমিতা বলেছেন— 'এটি শুধু একটি ঘড়ি নয়, সে-সময়কার সংস্কৃতির এক অপূর্ব প্রতিনিধি।' ঘড়ির বর্ণনাটি এরকম— 'মাঝখানে বসে থাকা মানুষটি ঘুরতে থাকে, আর তার হাতের কলমটি মিনিট নির্দেশ করে। এদিকে পর পর ঘটতে থাকে ঘটনাগুলি: একটি বাঁশি বাজে, মনে হয় যেন ওপরের ফিনিক্স পাখিটি ডাকছে; তারপর একটি বল নেমে এসে পাখিটিকে ঘুরিয়ে দেয়, তারপর বলটি এসে পড়ে ড্রাগনের মুখে, ড্রাগনটি সামনে এগিয়ে যায়, আর ড্রাগনের লেজটি এসে হাতির পেটে টান মারে, মাহুত হাতিকে ডাঙশ মারে— চক্রাকারে এই ঘটনাবলি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঘটতে থাকে। কারুশিল্প ও চারুশিল্পের এক অপূর্ব সমন্বয়।' সুমিতা এই প্রসঙ্গে স্বয়ং ঘড়ি-নির্মাতাকে উদ্ধৃত করেছেন— 'হাতি ভারতীয় ও আফ্রিকার সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী, ড্রাগনদুটি প্রাচীন চিনের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, ফিনিক্স পাখিটি পারস্যের সংস্কৃতির প্রতিনিধি, জল-যন্ত্রটি প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, আর পাগড়ি ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি।' কী চমৎকার সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ, তাই না!

ইসলামের সংকীর্ণচিত্ত ও পরধর্মবিদ্বেষী একটা ধারা ছিলই। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল উদার ও গ্রহিষ্ণু এক মনোভাব। বিশেষত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তো 'পিপল অফ দ্য বুক' হিসেবে 'ধর্মতুতো ভাই' (সুমিতার ভাষায়), তাদের ধর্মান্তরণের চেষ্টা প্রায় কখনোই হয়নি, বরং তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিভাকে সোৎসাহে সভ্যতার সমৃদ্ধিসাধনের কাজে লাগানো হয়েছে। গির্জা ভেঙে মসজিদ, আবার মসজিদের গির্জায় পরিণতির ঘটনাগুলি (উদাহরণ স্পেনের করদোবায় উম্মাইদদের নির্মিত প্রসিদ্ধ মসজিদ, যা গির্জা ভেঙে তৈরি, আবার যা এখন পুনরপি গির্জা) সভ্যতার এই ইতিহাসে বড়ো কথা নয়। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের আরো অনেক সূক্ষ্মতর, গভীরতর চর্চা এই ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, যা বুঝতে নিজেরও হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রয়োগ করতে হয়, ধৈর্য লাগে, সদিচ্ছা লাগে। অনেকসময়ে হয়তো মনে হয়, তার চেয়ে অতীত থেকে বাছাই-করা কিছু রেষারেষি, ভাঙাভাঙির কথা স্মরণ করে 'আমরা'-'ওরা'র ধারণা তৈরি করে

নিয়ে, তার ভিত্তিতে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুনখারাপি করা সহজতর। এটা মানব প্রজাতির বিরাট দুর্ভাগ্য! আর বিশেষ করে ইসলাম-ধর্মীয়দেরই অসহিষ্ণুতা নিয়ে আজকের যে ভ্রান্ত অথচ বহুলপ্রচারিত ধারণা, তার পরিপ্রেক্ষিতে সুমিতা মনে করিয়ে দিয়েছেন— স্পেনের ইসলামীয় রাজত্বে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সহাবস্থান, পরে বরং খ্রিস্টান রাজত্বেই মুসলমান ও ইহুদিদের ধর্মান্তর ও নির্বাসনের ইতিহাস।

উদার সমন্বয়ী প্রতিভাদীপ্ত সেই ইসলাম ইতিহাসের চক্করে কবে কীভাবে প্রবল গোঁড়ামি দ্বারা আচ্ছন্ন হল সে অন্য গল্প। রাজনৈতিক সুস্থিতি ও সংহতির অভাবে কী কমে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটল? সদ্য ধর্মান্তরিত মানুষরা কি অনেক ক্ষেত্রে বেশি ধর্মান্ধ হয়? আধুনিকতার শক্তি কী সাম্প্রদায়িকতার বোধকে বেশি করে জাগিয়ে তোলে? এই গল্প নিশ্চয়ই একেক স্থান-কালের পটভূমিতে একেক রকম। ভারতের ক্ষেত্রে গল্পটা আমাদের একটু জানা— মুঘল সংস্কৃতির অনেকটাই সমন্বয়ী আবহাওয়া থেকে আধুনিক যুগে ব্রিটিশ শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া, মুসলমান ও হিন্দু দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই; হিন্দু-মুসলমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই যুযুধান গোষ্ঠী হয়ে ওঠা। তবু তো, বিশ শতকের বিশের দশকে, যখন যুগ্ম অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে ব্যাপারটা ক্রমবর্ধমান তিক্ততা এমনকী দেশভাগের দিকে যেতে শুরু করেছে, এই বাংলার মাটিতেই তৈরি হয়েছিল *শিখা* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক উদারমনস্ক মানবতাবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। নজরুলের মতো মানুষরাও ছিলেন। এগুলি সামান্য উদাহরণমাত্র। ধর্মান্ধতার সঙ্গে যুক্তিবাদী ও উদার মানবতার লড়াই তো আজও নানা জনের দ্বারা নানাভাবে জারি আছে— হিন্দু-মুসলমান দুয়ের তরফ থেকেই, একেক সময়ে যতই হতাশ লাগুক না কেন।

আল-বিরুণী ভারতে এসে লক্ষ করেছিলেন— 'ওঁদের (হিন্দুদের) সব গোঁড়ামিই কেন্দ্রীভূত তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা ওঁদের অন্তর্ভুক্ত নন— অর্থাৎ বিদেশিদের।' তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশ নির্মোহভাবে মুসলমানদের ধ্বংসক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেছিলেন— 'মাহমুদ এই দেশের সবকিছুই প্রায় ধ্বংস করে ফেলেন'। সুমিতা মন্তব্য করেছেন— 'মনে রাখতে হবে এই মাহমুদ (গজনী)-এর সঙ্গেই আল-বিরুণী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এরকম কঠিন কথা বলতে আল-বিরুণীর আটকায়নি। আজকালকার সব পণ্ডিতরা যদি তাঁর মতো হতে পারতেন।' আল-বিরুণীর বক্তব্যটিতে এই প্রশংসনীয় সাহস ছাড়াও যে নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ পরিস্ফুট সেটাও বোধহয় আজ শিক্ষণীয়— বিশেষত তাদের পক্ষে যারা কোনো ধর্মের প্রতি আনুগত্য বশত (সেই ধর্মটা আবার নিজেদের সুবিধে মতো বানানো) জেনোফোবিয়ায় মত্ত হয়ে পড়ছে দিন দিন। অতীতের কোনো অনাচার-অত্যাচারের ঘটনার (এই যেমন মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ) ঐতিহাসিক পটভূমিটা মাথা ঠান্ডা রেখে বুঝে নিলে আজকের দিনে সামগ্রিকভাবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর হিংস্র ক্রোধ আছড়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুলতান মাহমুদও যেমন ভারতে এসেছিলেন, ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন, তাঁরই সঙ্গে এসেছিলেন আল-বিরুণীও, যিনি ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ আগ্রহ নিয়েছিলেন, ব্রহ্মগুপ্তের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বই *ব্রহ্মসিদ্ধান্তে*-র যেমন সমালোচনা করেছিলেন, ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনায় হজরত মহম্মদের সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেছিলেন। মানুষজাতিকে খোপে খোপে ভাগ করা নয়, সর্বজনীনতার বন্ধনে বেঁধে একটা এক অথচ বহুমাত্রিক মানবসভ্যতার সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন এ-ধরনের সব মানুষ। সত্যি এটা আমাদের প্রজাতিগত দুর্ভাগ্য যে সেই প্রক্রিয়া একবিংশ শতকে এসে দেশে-বিদেশে 'Clash of Civilizations'-এর চেহারা নিল।

বইটি পড়া হয়ে গেলে কিছু প্রশ্ন মনে জাগে। আলোচিত সভ্যতার বিশাল স্থানগত পরিসর ও বিপুল কাল-কাঠামো নিশ্চয়ই সমসত্ত্ব ও সমরূপ ছিল না। মোটের ওপর প্রতিভাধর পণ্ডিতদের বিরাট অবদান ও মানবসভ্যতার দিক থেকে তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েও একেকটি ছোটো ছোটো স্থান, কাল বা সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে তার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে কৌতূহল থেকেই যায়। প্রশ্ন ওঠে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে, বস্তুত তাদের জীবনধারণের মান নিয়েও। ইবন খালদুনদের মতো পণ্ডিতদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েও ইসলামীয় সভ্যতায় সামাজিক-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা বিকাশের কম-বেশি নিয়ে বইটি তেমন কিছু বলে উঠতে পারেনি। সুমিতা নিজেই দেখিয়েছেন ইউরোপের মধ্যযুগকে যতটা অন্ধকার একদা ভাবা হত, আসলে ততটা নয় (সেটা শুধু ইসলামীয় সভ্যতার প্রভাবে নয়, আরো অনেক কারণেই; এমনকী চার্চও যে আলো জ্বালানোর কাজটা একেবারে করেনি তা নয়)। দীর্ঘ হাজার বছর ধরে একটি মহাদেশ জুড়ে পরিবর্তনহীন অন্ধকার যুগ ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব। মেধা ও মানবতা অনেক প্রতিকূলতার মুখে অতন্দ্র জেগে থাকে। তেমনি গৌরবের ইতিহাসেও ছায়া ফেলে অনেক অবাঞ্ছিত ধ্যানধারণা বা কার্যকলাপ। কুটিলমনা ইতিহাসের ছাত্রের মনে ভিড় করে আসে এসব প্রশ্ন। তা আসুক, তবু এ অতি মূল্যবান এক বই।

সুমিতা দাস, *অন্য এক রেনেসাঁস: আরবি-ইসলামীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ,* পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৮

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

আজীবন সদস্যদের তালিকা

অচ্যুৎ মজুমদার
অজয় মেহতা
অম্বিকেশ মহাপাত্র
অদিতি মেহতা
অনন্তরামন বৈদ্যনাথন
আণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়
অনীতা সেন
অনির্বাণ দাশগুপ্ত
অঞ্জনকুমার দাস
অপূর্ব কর
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অভিজিৎ সেন
অমিতকুমার রায়
অমিতাভ রায়
অমিয়কুমার বাগ্‌চী
অরুন্ধতী দত্ত
অলকানন্দা পটেল
অলোককুমার ভট্টাচার্য
অশোক মিত্র
অশোকনাথ বসু
ইমানুল হক
উজ্জ্বলা দাশগুপ্ত
উৎসা পট্টনায়ক
ঋতা মজুমদার
ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়
একরামুল বারি
কিংশুক দত্ত
কুমারদেব বোস
কুণাল বসু
গৌতম নওলখা
চন্দ্রশেখর বসু
চারুসীতা চক্রবর্তী
জয়তী ঘোষ
জয়ন্তী সান্যাল
জর্জ রোজেন (প্রয়াত)
জিতেন্দ্র পাচাল
জ্যোতির্ময় ঘোষ (প্রয়াত)
ডলরেস চিউ
ডালিয়া ঘোষ
ডি. এন ঘোষ
তরুণ সরকার
তাপসকুমার পাল
তাপস চক্রবর্তী
তাপসী দাস
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তৃষিতানন্দ রায়
ত্রিদিব ঘোষ
দিগন্তিকা পাল
দীপাঞ্জন গুহ
দীপককুমার ঘোষ
দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
দেবব্রত ঘোষাল
ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী
ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ
নবকুমার নন্দী
নিদাদাভেলু কৃষ্ণাজি
নির্মলকুমার চন্দ্র (প্রয়াত)
পবিত্র সরকার
পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা
পরিমল ভৌমিক
পানু ভট্টাচার্য
পি কে গুহঠাকুরতা
পীযূষ চক্রবর্তী
পীযূষ কান্তি রায়
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ ঘোষ
প্রভাত পট্টনায়ক
ফ্রাঁস ভট্টাচার্য
বারীন রায়
বাসন্তী সাহা
বিকাশরঞ্জন পাল
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
বিজয়া গোস্বামী
বিপ্লব নায়েক
বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওম্যান
বিভাস সাহা
মধুসূদন চৌধুরী
মল্লিকা আকবর
মানবী মজুমদার
মালিনী ভট্টাচার্য
মিতা পোদ্দার
মিহির ভট্টাচার্য
মীনা সেনগুপ্ত
মুকুল মুখার্জি
মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি
যশোধরা বাগচী (প্রয়াত)
রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী
রঞ্জন গুপ্ত (প্রয়াত)
রাজশ্রী দাশগুপ্ত
রীনা শর্মা
রূপক দাস
ললিতা চক্রবর্তী
শমিতা ঘোষ
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শর্বরী দাশগুপ্ত
শর্মিলা চন্দ্র
শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত
শান্তনু বসু
শিবানী রায়চৌধুরী
শ্যামল ভট্টাচার্য
শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপর্ণা মিত্র
শ্রীলতা ঘোষ
সব্যসাচী বাগ্‌চী
সমরাদিত্য পাল
সত্রাজিৎ দত্ত
সুকন্যা মিত্র
সুজিত পোদ্দার
সম্বুদ্ধ পোদ্দার
সুনন্দা সেন
সুশীল খান্না
সুস্মিতা গুপ্ত
সোমশংকর সিংহ
হেমেন মজুমদার

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

চিঠির বাক্সো

কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে। একজনের একটি স্মৃতির আপন বেগে বয়ে চলা রূপকথার রূপ বদলের তত্ত্বতালাশ; অপর জনের ক্রোধান্বিত পত্রবাণ। দুজনেই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের অত্যন্ত স্নেহভাজন। এ পত্রিকায় আজও অকুণ্ঠচিত্ত মতপ্রকাশের অবকাশ আছে এই বিবেচনায় আপনার সমীপে এই দ্বিধাবিলম্বিত পত্র।

আরেক রকম-এর অক্টোবর ২০১৮-র যুগ্মসংখ্যায় প্রণব বিশ্বাস মহাশয় রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' পাঠ করে মনে হয়েছিল এ যেন আমাদের মত, অনুশোচনাহীন বামপন্থীদের একটি চিন্তাধারার প্রস্থানবিন্দু হতে পারে। ব্যক্তিগত স্মৃতিপথে দু-কন্যার বিদায় সম্ভাষণ থেকে, ঠাকুমার মা'র ঝুলির অনুষঙ্গে, লোক-ঐতিহ্যের সুতোয় ভর করে বিষ্ণু দে, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী ছুঁয়ে সুভাষে এসে শেষ ফোঁড় দিয়ে যে নকশি কাঁথা শ্রীবিশ্বাস বুনে চলেন, তাতে অব্যবহার্য, পুরোনো সামগ্রী কাজে লাগিয়েও কী স্বভাবজ সুন্দর; এবং তার ব্যবহারিক মূল্যও আছে বটে। আজ এতদিন পর মাঝবয়সে এসে, ইতিহাসচর্চা ও চর্যার প্রচেষ্টায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পঙ্‌ক্তি পড়ে চোখে ভাসে সুভাষিণী গোলদারের মুখ। প্রয়াত রঙ্গলাল গোলদারের স্ত্রী। এই রঙ্গলাল গোলদার ছিলেন মরিচঝাঁপির ভলান্টিয়ার ইনচার্জ। এদের কাজ ছিল মরিচঝাঁপিতে ধরে রাখা উদ্‌বাস্তুরা যেন পালিয়ে নদী পার হয়ে, এপারে কুমিরমারির সরকারি ত্রাণশিবিরে চলে আসতে না পারে। 'উন্নয়নশীল উদ্‌বাস্তু সমিতি'র তাবড় নেতাদের কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। মরিচঝাঁপিতে এক-দু-বিঘা জমি পাবার আশায়, ঘরের সামান্য সোনাদানা তুলে দিয়েছিলেন নেতাদের হাতে। ১৯৭৯ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এলাকার চোরাই কাঠ বিক্রির আর জমির সেলামি বাবদ সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেতারা উধাও হলেন। সমিতির সভাপতি সতীশ চন্দ্র মণ্ডল ফিরে গেলেন পুরোনো কারবার, মাছের আড়তদারিতে। রাইচরণ বাড়ৈ পালালেন বাংলাদেশে। জঙ্গলের মধ্যে, বাঘের মুখে পড়ে রইলেন হতভাগ্য কয়েক হাজার গরিবগুরবো, যারা আরেকটু সুখের আশায় নেতাদের মিথ্যে আশ্বাসে, দণ্ডকারণ্যর পুনর্বাসন ছেড়ে এসেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রঙ্গলালরা আবারও উদ্‌বাস্তু। নিজের ছেড়ে আসা এলাকায় ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাদের ঘরবাড়ি, রেশন দোকান সব বেহাত। অবশেষে ঘুরে ঘুরে ক্যানিংয়ে এক প্রত্যন্ত এলাকায় ঠাঁই গাড়লেন, রঙ্গলাল নিজের জীবনের পরিহাসের কথা ভেবেই বোধহয় সেই গ্রামের নাম রেখেছিলেন 'পথের শেষে'। অনেক পরে রঙ্গলালের বিধবা স্ত্রীকে সাক্ষাতে যখন জানতে চাওয়া হয়, মরিচঝাঁপিতে ওঁর পরিবারের কেউ মারা গেছেন কিনা, তাতে ওঁর জবাব ছিল— 'আমাগো কেউ মরে নাই। তবে পাশাপাশি অনেকেই ভেদবমি, ওলাওঠায় মরছিল'। অর্থাৎ যাদের মরিচঝাঁপিতে ধরে রেখে নেতারা আন্দোলন জিইয়ে রাখার অপচেষ্টা করছিলেন। সর্বক্ষেত্রে, সর্ব সময়ে সর্বহারাই কেন ক্লেশ সইবে? বাম ও গণতান্ত্রিক দলের ঐক্যের যে স্লোগান নির্ভর করে ক্ষমতায় বামফ্রন্ট, সাতাত্তর সালে সরকারের পত্তন করলেন, তা তো এক অপরূপ দুর্ঘটনা। জনতা দলের প্রফুল্ল সেন মহোদয় নির্বাচনে প্রার্থী অংশীদারি নিয়ে একগুঁয়ে অবস্থান নেওয়ায়, বামেরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে লড়বার সিদ্ধান্ত নেন, যার পরিণাম ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের সরকার গঠন। সেই সময়ে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায়, অশোক মিত্র মহাশয়ের অতি প্রিয়, সমর সেনের এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উচ্চারিত সতর্ক বার্তা আবার মনে পড়ে। বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসীন হওয়ায়, তাঁর দুর্ভাবনা ছিল যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে লড়ে এই সরকার মসনদে গদিয়ান, তার হাতে ব্যবহার্য মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্র সমূহ, বিরুদ্ধ শ্রেণিচরিত্রের। সেই আয়ুধ ইস্তেমাল করে আদৌ কি সাধারণ মানুষের সমস্যার উপশম সম্ভব?

ইতিহাস সবসময়েই শাসনতন্ত্রের শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ী রচিত হয় আর প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম তো

চিরকাল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল; কিন্তু সেইসময় কী ভূমিকা ছিল বাম-শরিক দলগুলির? কী আচরণ করেছিলেন কেন্দ্রে আসীন জনতা দল, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরা তানাশাহীর বিরুদ্ধে, সুস্থ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, নির্বাচনী লড়াইয়ে যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিলেন ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি? একদিকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ৩১ মার্চের মধ্যে শরণার্থীরা নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন না করলে, তাদের পূর্বেকার বিলি করা জমিজিরেত এবং সবরকম সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা হবে। অন্যদিকে জনতা দলের সাংসদরা সদম্ভে শরণার্থীদের আন্দোলনে প্ররোচিত করছেন। কাশীকান্ত মৈত্র, হরিপদ ভারতী মহোদয়রা বহিরাগতদেরও মদত দিচ্ছেন, সংঘর্ষ বজায় রাখতে। কলকাতায় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের, আন্দোলনের সপক্ষে সত্যাগ্রহ। বাম শরিকদেরও বা সেদিন কী ভূমিকা ছিল ফিরে দেখার প্রয়োজন নেই কি? চৌত্রিশ বছরের দূরত্বে, এসব স্মৃতি-লাঞ্ছিত পুনর্বিবেচনায়, এ প্রশ্নই জাগে, আমার দেশের গণআন্দোলন এবং শাসন ব্যবস্থার সম্পর্কে আদতে কি এক অসঙ্গতি? সংবিধান সভায় প্রদত্ত তাঁর শেষ ভাষণে, বাবাসাহেব আম্বেদকর একটি মন্তব্য করেছিলেন ভারতের মাটিতে একটা কোনো সমস্যা আছে, এখানে কী করে যেন গণতন্ত্র থেকে জন্মায় স্বৈরাচার। ভাববার কথা বটে! বিশেষত— নয়া-উদারীকরণ পরবর্তী গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক, এখন তা ব্যস্তানুপাতিক। বর্তমানে সুশাসন মানেই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একশো বছর বিরোধীদের মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে বললে সেটি শিষ্ট সমাজে সম্মতি পায়; কিন্তু মাসাধিককাল জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে সরকারের বিরোধিতা করার গণতন্ত্র অনুমোদন করলে তা শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা হিসেবে সমালোচিত হয়। মরিচঝাঁপির ক্ষেত্রেও, ১৯৭৫ সালে উদ্‌বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের প্রচেষ্টা যখন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার বলপূর্বক প্রতিহত করেন, তখন কারুর মনে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। বিশ্বাস মহাশয়ের সন্দর্ভে, অবশ্য এসব আভাস আদপেই নেই; তিনি বরং যুগে যুগে রূপকথারা কেমন নতুন অনুষঙ্গে নবরূপ পরিগ্রহ করে তাই দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর রচনাটি আমার ভাবনাকে কী হাওয়ায় মাতাল, এটুকু জানাতে পারলেই স্বস্তি পেতাম।

কিন্তু '১-১৫ নভেম্বর ২০১৮' সংখ্যায় স্বনামধন্য সুজিত পোদ্দার মহাশয়ের চিঠি পড়ে, কিঞ্চিৎ দুর্ভাবনা হচ্ছে। অশোক মিত্রকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন; তিনি স্বভাবতই তাঁর গুণগ্রাহী। আমরাও দূরে থেকে, ব্যক্তিগত কোনো পরিচিতি ব্যতিরেকে, তাঁর যারপরনাই অনুরাগী। অশোক মিত্রর পছন্দ নয় বলে, ঘটনাটির পরোক্ষ উল্লেখও নামঞ্জুর? এ তো অভূতপূর্ব গা-জোয়ারি! অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিমান লেখক অমিতাভ ঘোষ তাঁর 'হাংরি টাইডস' উপন্যাসে, উদ্ভট ও অলীক কিছু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রর সহায়তায় মরিচঝাঁপির বাজার চলতি কাহিনিই ফেঁদেছেন। সে বইয়ের কাটতি ঈর্ষণীয়। কীভাবে ঠেকানো যাবে সেই সত্যের মুদ্রিত অপলাপ? শাসকশ্রেণির সংস্কৃতিই, সমাজে সর্বাধিক প্রভাব-বিস্তারি; কথাটা কার্ল মার্কসের। এর বিপ্রতীপে পালটা সাংস্কৃতিক সংগ্রামই বোধহয় একমাত্র পথ। কিন্তু পোদ্দার মহাশয়, তাঁর উষ্মা প্রকাশে যেভাবে অপ্রসঙ্গ টেনে আনলেন তাতে কোনো নির্ণায়ক দিশা অনুপস্থিত। প্রথমত, শঙ্খ ঘোষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন কেন বোধগম্য হল না? মতান্তর হলে, সৌজন্য মেনেও যে উচ্চস্তরের মতবিরোধিতা সম্ভব; তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে, বহু পূর্বে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত মিত্র মহাশয়ের 'শরতে আজ কোন অতিথি' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের বিরোধিতায় ঘোষ মহাশয়ের, কিংবদন্তি কবিতা 'বাবুমশাই' আজও আমাদের স্মৃতিতে জাগরূক।

অশোক মিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কিছু কম নয় কিন্তু প্রসঙ্গ যখন উঠলই, পোদ্দার মহাশয়কে সবিনয়ে জানানো যেতে পারে, দীর্ঘকাল পরে রোমন্থন করতে গিয়ে *একদা নিশীথ কালে*-তে হয়তো তাঁরও স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে। ওই নিবন্ধে, তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নিজের কথা গোপন রেখেই অশোক মিত্র বিধৃত করেছেন '...মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আপনাকে গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন। নিশীথ প্রভাত হল। সাত সকালেই খবর পৌঁছলো, মরিচঝাঁপিতে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় নি।...'

অপর দিকে, ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিধানসভার বিবৃতি উদ্ধৃত করা যায়... '(এই) প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকার ফলে পুলিশ ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ ও পুলিশের গুলি চালানোর দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত

নিয়েছি, সরকারের পক্ষ থেকে যে দুজনের মৃত্যু ঘটেছে তাঁরা অপরাধী হোন বা না-হোন তাঁদের পরিবারবর্গকে কিছু টাকা দেব ঠিক করেছি...'। অশোক মিত্রর অপছন্দের, শুধু সেই কারণেই, বিষয়টি পোদ্দার মহাশয়ের কাছে স্পর্শকাতর হলে, তা বড়োই পরিতাপের। সেই সময়ের থেকে ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মানুষ তিনি, এটা কেন ভাবলেন না যে প্রশ্নটা শুধু নির্বাচিত বামপন্থী সরকারকে হেয় করা নয়; আরো গভীর ভাবনার বিষয়, এই শাসন ব্যবস্থায় গদিয়ান হয়ে সত্যিই কি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পরিত্রাণ সম্ভব? না কি শাসন-চরিত্রের গ্রহের ফেরে, একটি অঙ্গরাজ্যের যে বামপন্থী সরকার, একদা বর্গাদারের ত্রাতা হিসেবে সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তারই সিঙ্গুরে কৃষকদের কাছে বিশ্বাসঘাতক বনে যাওয়া, আমাদের দেশে সংসদীয় বামপন্থার নিয়তি? সমস্যাটা একান্ত বামপন্থীদের। ধমক দিয়ে সমস্যাটা ধামাচাপা দিতে চাইলে অশোক মিত্রর ভাষা ধার করে বলি— নিজেকে নিজের চোখ ঠারা হবে।

ভাস্কর দাশগুপ্ত
কলকাতা

২

আপনার সম্পাদিত *আরেক রকম* পাক্ষিক পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যায় শ্রীমতী সুলেখা অধিকারীর লেখা 'বাধা পেরোনোর গল্প' সত্যিই আরেক রকম গল্প। গল্পের কুশীলবরা সবাই আমাদের সংস্থার কর্মপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছেলে-মেয়ে।

আসলে ২৫ বছর আগে কয়েক জন মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে-মেয়ের অভিভাবকরা অনুভব করলেন যে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা যখন আস্তে আস্তে বড়ো হবে তখন বাবা-মায়েরাও অনেক বয়সে পৌঁছে যাবেন। তাঁদের অবর্তমানে ছেলে-মেয়েদের কী হবে। এই চিন্তা থেকেই পার্টনার-হুগলির জন্ম। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরু হয়ে যায়। একদিকে ছেলে-মেয়েদের কর্মপ্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে হাতের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাচ-গানের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সত্যিই যে তারা ভিন্নভাবে সক্ষম তা প্রমাণ করা এবং একইসঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র যাঁরা এখনও এই ছেলে-মেয়েদের উৎপাদনশীল সম্পদ মনে করে না, তাদের সার্বিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেয় না। তাদের সচেতন করতে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ, যেমন বিভিন্ন সাধারণ স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠান করা। বিভিন্ন ক্লাবে অনুষ্ঠান করা, সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমাদের ছেলে-মেয়েদের যোগদান করানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে এরা সত্যিই ভিন্নভাবে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও মনে করি আমাদের প্রচেষ্টা সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। এত বিশাল জনসমাজে প্রান্তিক সীমায় বাস করা (আমরা মনে করি, বৌদ্ধিক ও বিকাশগত অসুবিধাযুক্ত মানুষরা সবচাইতে প্রান্তিক সীমার মানুষ) মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কথা সবার কাছে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তাই আপনাদের মতো মননশীল বিদগ্ধ পাঠকসমাজে পূর্ণ একটি পত্রিকায় এদের কথা সামনে আসায় আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

পার্টনার-হুগলীর (৯৪৩৩১৫১৩৯৬) পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা প্রকাশ করে গর্বিত করার জন্য।

তপন কর
সম্পাদক, পার্টনার-হুগলি

৩

আরাক রকম-এর ১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় 'অক্ষয় বটের দেশ'-এ কালীকৃষ্ণ গুহের লেখায় আছে যে আমি মেদিনীপুরের কোনো কলেজে পড়িয়েছি। এটা ছিল লেখকের অনুমান যেহেতু বইতে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। আমি হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার একটি কলেজে পড়িয়েছে।

যেহেতু মেদিনীপুরে বাড়ি করেছি হয়তো সে কারণেই তাঁর এই অনুমান।

দীপক কর
মেদিনীপুর

পুনঃপাঠ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকাণ্ডের কিংবদন্তি নায়ক সূর্য সেনের সুযোগ্য সহযোগী ছিলেন বিপ্লবী গণেশ ঘোষ। আন্দামান সেলুলার জেলে মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর বামপন্থা ও গরিব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন এই অসামান্য অকৃতদার ব্যক্তিত্ব। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ ছিল তাঁর ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে আমরা দুটি লেখা পুনঃপাঠ বিভাগে ছাপছি। প্রথমটি গণেশ ঘোষের মৃত্যুর পর অশোক মিত্রের লেখা কলাম যা ওঁর প্রবন্ধ সংকলন 'অকথা-কুকথা' (আজকাল প্রকাশনী) থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারকপত্রী থেকে দ্বিতীয় রচনাটি গৃহীত।

কে গেলেন? গণেশ ঘোষ, স্বদেশী করত

অশোক মিত্র

উজ্জ্বল দিন, সূর্য মধ্যগগনে, গণেশ ঘোষের শবানুগমনে, ঐ ঘন্টা দেড়েক-দুই সময়ে, দুটো বিপরীত দৃশ্য চোখে পড়ল। বয়সে একটু প্রবীণ, ষাট পেরিয়েছেন এমন পুরুষ-মহিলা, সাধারণ শ্রমজীবী থেকে শুরু করে সচ্ছল মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত, অনেকে দোতলা-তেতলা-চারতলা বাড়ির জানালায় বা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন শবযাত্রা দেখতে, অথবা রাস্তার দু-পাশে জড়ো হয়ে ভক্তিশ্রদ্ধাভরে যুক্তকর শেষ নমস্কার জানিয়েছেন, অথবা লাল সেলাম। কিন্তু পাশাপাশি অন্য দৃশও : শৌখিন গাড়ি চেপে বড়োলোক বাড়ির মহিলা প্রাক্-বড়োদিন বাজার করতে বেরিয়েছেন, বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই, সম্ভবত কেনাকাটার ফাঁকে সদ্য-সদ্য চুল ছাঁটিয়ে-ফাঁপিয়ে এসেছেন, পিছনের আসনে মহিলার পাশে ডাঁই-করা ক্রীত নানা শৌখিন জিনিশপত্র, ট্র্যাম লাইনের যে-পাশ দিয়ে শবযাত্রা এগোচ্ছে, তার উল্‌টো দিক দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, মিছিলের ভিড়ের জন্য একটু শ্লথগতিতে, মহিলা নির্বিকার কিংবা সামান্য বিরক্ত, সামনের আসনে চালকের প্যাশে স্কুলের-পোশাক-পরা গলায়-টাইয়ের-ফাঁস-বাঁধা ছেলে, চকোলেট আইসক্রিমের কাঠি চুষছে, মর্মান্তিক শোনালেও জীবনানন্দের ভাষা ধার করে বলতে ইচ্ছা হয়, কোনো সাধ নাই তার গণেশ ঘোষের তরে। কিংবা এই ভদ্রমহিলার, কী তার সন্তানের, হয়তো কোনোদিন কোনো উপলক্ষেই কোনো প্রসঙ্গেই গণেশ ঘোষের নাম শোনা হয়নি, স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্ম। শিষ্টাচারমন্ডিত সমাজে আমাদের বাস করতে হয়, যদিও একবার ঝলক দিয়ে খেয়াল চাপার উপক্রম হয়েছিল, মিছিল থেকে ছিটকে গিয়ে গাড়ির মধ্যবর্তী হয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে বলি : এই-যে তুমি মস্ত গাড়িতে চড়ে মিহিন পোশাক পরে নিশ্চিন্ত আরামে চকোলেট আইসক্রিম চুষতে-চুষতে যেতে পারছো, এই-যে তোমার মা-জননী পুঞ্জিত বৈভবকে আর কীভাবে কোন্-কোন্ সম্ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন তার খেই পাচ্ছেন না, তোমাদের যে বাহির বাড়ি-ভিতর বাড়িতে সমপরিমাণ ঝাড়লণ্ঠনের সমারোহ, তার জন্য তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল যে-মানুষটি চলে গেলেন তাঁর কাছে, তোমাদের সেই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নেই, কারণ স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই, আসলে স্বদেশের সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় নেই।

অভিমান, নেহাৎ বাষ্পভারাতুর অভিমান, ষাট বছর আগে বালক ছিলাম, আমাদের মানসপটে দেবতার স্থান জুড়ে ছিলেন গণেশ ঘোষ-অম্বিকা চক্রবর্তী-অনন্ত সিংহরা, তাই, এই ষাট বছর বাদে, প্রায় বালকোচিত অভিমান। গত সপ্তাহে শবানুগমনের মুহূর্তে যে-অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে প্রায় মিলে যায় বছর দশেক আগেকার একটি ঘটনার স্মৃতি। ব্যস্ততম সময়, সকাল দশটা কি সাড়ে-দশটা অফিসমুখো ট্র্যাম-বাস-গাড়ির ভিড়, হাজরা ও হরিশ মুখুজ্যে রোডের সংযোগস্থল, বাসের পর বাস হুড়মুড় করে আসছে, দাঁড়াচ্ছে কি দাঁড়াচ্ছে না, ভিড়ে ঠাসা, উভয় দরজায় পাদানিতে ঝুলেই সম্ভবত এককুড়ি লোক, বাসের পিছনেও ভয়াবহভাবে ঝুলন্ত একজন-দু'জন ঝাঁকামুটে, এরই মধ্যে কেউ-কেউ কোনো কেরামতিতে বাসের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন, একজন-দু'জন বেরুচ্ছেনও। হঠাৎ চোখে পড়ল, গণেশদা, বয়স পঁচাশি ছুঁই-ছুঁই, ডালহৌসিগামী যে-কোনো-একটি বাসে ওঠবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একটি বাস দত্যির মতো এসে পাঁচ সেকেন্ডের মতো দাঁড়ায়, গণেশদা এগিয়ে যান, ভিড়ের ঝাপ্‌টায় পশ্চাদপসরণ করেন, দুর্বল শরীরে এর-ওর-তার দেওয়া ধাক্কা সহ্য করেন, তাঁকে না-নিয়েই বাস

এগিয়ে বাঁক নিয়ে হরিশ মুখুজ্যে রোডে পড়ে। মিনিট দেড়েক বাদে আরেকটি বাস, গণেশদা আবার এগোন, ফের ধাক্কার ঝাম্‌টা খেয়ে পিছিয়ে আসেন, কাঁচুমাচু মুখ, পরের বাসের জন্য পরীক্ষা। পরের বাস এসে আধা-দাঁড়ালো মাত্র, কিন্তু একই কাহিনী। গণেশ ঘোষকে কেউ চেনে না, সম্ভ্রম করে তাঁকে একটু জায়গা করে দেওয়ার মতো কেউ নেই। এমন মুহূর্তে গাড়ি করে পরিচিত কেউ যাচ্ছিলেন, দেখতে পেয়ে, শশব্যস্ত, প্রায় পাঁজাকোলা করে আপত্তি-জানাতে-থাকা গণেশদাকে গাড়িতে তুলে নিলেন।

এমন মানুষই ছিলেন গণেশ ঘোষ। সমাজকে শুধু দিয়ে যেতে হয়, সমাজের কাছ থেকে কিছু নিতে নেই, সেটা পাপ : অফিস-পাড়ায় গণেশদার হয়তো সামান্য কিছু কাজ ছিল, নিজের কোনো প্রয়োজন নয়, হয়তো কেউ ওঁকে ধরে পড়েছেন অমুক মন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমার জন্য এই সুপারিশটা করে দিতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে গণেশদা সটান ডালহৌসি-মুখো, অথচ পরিচিতি-অনুগত যে-কাউকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারতেন, তাঁর নিজের লালদিঘি যাওয়ার কোনো দরকারই ছিল না, কিংবা একে-ওকে-তাকে খানিক সময়ের জন্য একটা গাড়ি পাঠাবার কথা বলতে পারতেন, পার্টি দপ্তরেও একটা ফোন করতে পারতেন। কিন্তু না, গণেশদা গণেশদা-ই, অন্যের জন্য শুধু করে যেতে হয়, অথচ অন্য-কাউকে কোনো কারণেই বিরক্ত করা নেই। গণেশদা গ্রহণ করবার বিদ্যা জানতেন না, শুধু দিতে জানতেন, অপরের জন্য করতে জানতেন।

সুতরাং সেই কয়েক-বছর-আগে-দেখা দৃশ্যে অস্বস্তি-অপরাধবোধ যুক্ত হলেও পঁচাশি-বছর-অতিক্রান্ত গণেশদার আমাদের লুকিয়ে বাসে চড়ার চেষ্টায় আশ্চর্য হইনি। বেদনাহত হতে হয়েছিল অন্য কারণে। সমাজ বলে যে বৈদেহী ব্যাপারটিকে আমরা সকাল-বিকেল উল্লেখ করি, সেই সমাজ কত স্মৃতিবিহীন, বিবেকরহিত, কত নিকষ নৈর্ব্যক্তিক। স্বাধীনতার পর তখন চল্লিশ বছরও পেরোয়নি, সনাতন কলকাতার রাস্তার মোড়ে, দেড় ছটাক দূরত্বে যদু ভটাচার্য লেনে একতলার এক কামরার অন্ধকার ঘরে বহু বছর ধরে আছেন গণেশদা, কিন্তু হাজরা-হরিশ মুখুজ্যে রোডের মোড়ে সকালের ব্যস্ততম সময়ে সওদা-করতে-বেরুনো দপ্তরে-হাজির-হতে-বেরুনো ধান্দায়-বেরুনো হাজার মানুষের ফুরসৎ নেই গণেশ ঘোষকে চেনবার, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বীর নায়ক গণেশ ঘোষ, নবতিবর্ষ-উত্তীর্ণ জীবনের পুরো এক-তৃতীয়াংশ সময় জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের বেঁচে-থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কারাকক্ষে অতিবাহন-করা গণেশ ঘোষকে কলকাতার রাস্তায় কেউ চেনবার নেই। সমাজ পাল্‌টে গেছে, সমাজ পাল্‌টে যায়। একদা যাঁরা বীর নায়ক ছিলেন, যাঁদের তিতিক্ষায়-আত্মত্যাগেই স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত হয়েছিল, সেই মানুষগুলি তো ক্ষমতার কাছাকাছি অলিন্দ-বারান্দা দিয়ে ঘোরাফেরা করেননি, খবরের কাগজে প্রতিদিন তাঁদের নাম বেরোয় না, বেতারে-দূরদর্শনে তাঁদের ভাষণ উল্লেখিত বা তাঁদের প্রতিভাস অবলোকিত হয় না, বিশেষ বিমানে চেপে তাঁরা শৌখিন বিদেশ সফরে বেরোন না, তাঁরা যদু ভট্টাচার্য লেনের একতলার এক ঘরের অন্ধকার কুঠুরিতে দিনাতিপাত করেন। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন হচ্ছে, পৃথিবীর চেহারা বদলে যাচ্ছে, আমাদের দেশের-সমাজের চেহারা-চরিত্রও। গণেশ ঘোষকে কেউ চেনেন না, দু-একজন হয়তো নাম শুনেছেন, তা-ও গণেশদা দু-একবার গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সুবাদে। যে-বাসে উঠতে গিয়ে, যে-বাসগুলিতে উঠতে গিয়ে, গণেশদা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, সেই ব্যস্ত অফিসদিনের সকালে তাদের-ভিতরে-ঠেসে-বসা-দাঁড়ানো মানুষগুলি স্বচ্ছন্দে আমাদের ছেলেবেলায়-শোনা ছড়ার ব্যঙ্গানুকরণ করতে পারতেন : কে জানে তোর গণেশ ঘোষ কে জানে তোর কী, বাসের ভিতর বসে মোরা তেঁতুল-চিঁড়ে খাই, দে দিকিনি একটা ধাক্কা কদ্দুর যাই।

চিন্তার আদৌ কারণ নেই, সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, জাতি এগিয়ে যাচ্ছে এতই এগিয়ে যাচ্ছে যে গণেশ ঘোষরা যে-স্বাধীনতা বিদেশীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে দিয়েছিলেন, মহাসমারোহচর্চা চলছে কী করে তা সেই বিদেশীদের কাছেই ফের বিকিয়ে দেওয়া যায়, এ-কুসুমভার হয়েছে অসহ। তাই এক হিশেবে ভালোই হলো গণেশদা অবশেষে চলে গেলেন, ভালোই হয়েছিল যে শেষের এক বছর-দুবছর ধরে গণেশদা একটু-একটু করে বিস্মরণে ডুবে যাচ্ছিলেন। যে-সমাজ তাঁকে প্রায় ভুলে যেতে উদ্যত, কী দরকার তার সম্পর্কে আর সজাগ-সচেতন থেকে! প্রকৃতি, অতএব মনে হয়, তার নিজের নিয়মে যথোচিত কাজ করে যাচ্ছিল, প্রকৃতির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

তবে, রবীন্দ্রনাথ উক্তি করে গেছেন, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। কে জানে, আজ থেকে কয়েকশো বছর বাদে ইতিহাস ফের নতুন করে বিশ্লেষণ করবে, বিচার করবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে, স্মৃতিতে-ফিকে-হতে-হতে-প্রায়-সম্পূর্ণ-মিলিয়ে-যাওয়া গণেশ ঘোষকে নতুন করে মালা পরিয়ে দেবে। তবে তা তো ভবিষ্যতে-হলে-হতে-পারে ঘটনাসম্পাত। ইতিমধ্যে ষাট-সত্তরে পৌঁছুনো আমাদের মত কতিপয় বৃদ্ধ, যাঁরা বাল্যে-শৈশবে-কৈশোরে গণেশ ঘোষদের দ্বারা প্রজ্বলিত আদর্শের আগুনের একটু হালকা ছোঁয়া পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলাম, কিংবা পরবর্তী সময়ে আরো-একটু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর যে-ক'টা দিন

থাকবো পরস্পরের কাছে গণেশদার কথা বলাবলি করবো, গণেশদার ত্যাগের কথা, তাঁর ঔচিত্যবোধের কথা, তাঁর নম্রতা-বিনয়-সৌজন্যের কথা। মুজাফ্‌ফর আহমদের মতোই, পারতপক্ষে কাউকে 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' সম্ভাষণ করতেন না, এটা কোনো ভণিতা বা ভড়ং ছিল না, সব-মানুষকে-সমান-শ্রদ্ধা-জানাতে-হয়-সব-মানুষকে-সমান-বিভঙ্গে-প্রণাম-করতে-হয় এই প্রতীতিপ্রসূত তাঁর এই সম্ভাষণচারিতা। দেখা হলে, যে-কারু সঙ্গে দেখা হল, লম্বা-ঋজু শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকে নিয়ে হাত জোড় করে কুশল প্রার্থনা করবেন, তাঁর কোমল কণ্ঠলাবণি থেকে মধুর উৎসারণ। বিনয় তাঁর স্বভাববিভূতি : কোনো বাড়িতে পদধূলি দিয়েচেন, সবাইকে ডেকে আলাপ করেছেন, চা-জল পান করেছেন, বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে সকলকে তাঁর সকৃতজ্ঞ নমস্কার জ্ঞাপন, গৃহভৃত্য কিংবা পরিচারিকাকে পর্যন্ত আলাদা ডেকে গণেশদার ধন্যবাদ জানানো। গণেশদার সৌজন্যবোধ নিয়ে আমরা শুধু প্রতিনিয়ত বিব্রতই হইনি, মাঝে-মধ্যে তাঁর আপাত-বিনয়াতিশয্য নিয়ে আড়ালে রঙ্গ করছি, মাঝে-মধ্যে গপ্পোকাহিনী ফেঁদেছি পর্যন্ত। যাদবপুর-পেরুনো এক উদ্বাস্তু কলোনিতে গণেশদা এক শীতের সকালে কার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, কলোনিতে কিছু অবশিষ্ট খাল-পুকুর-শান্ত গাছের সারি, একটি কিশোরী মেয়ে, কোলে বছরখানেকের এক শিশু, খালপাড়ে দাঁড়িয়ে, গণেশদাকে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত, কোলের শিশুকে সামলে এগিয়ে এসে কোনোক্রমে গণেশদাকে প্রণামের চেষ্টা। গণেশদা, চিরাচরিত গণেশদার মতো, ঝুঁকে পড়ে কিশোরীকে সুসনম্র সম্ভাষণ : 'দিদি, ভালো আছেন তো?' কিশোরীর বিব্রত-রাগত অনুরোগ : 'গণেশদা, আপনাকে নিয়ে পারা যায় না, আমার মতো পুঁচকে মেয়েকে কেন যে আপনি বলেন।' গণেশদা আমতা-আমতা নামতা আওড়ান : 'তাতে কী, তাতে কী।' কিশোরীর ফের অনুযোগ, প্রসঙ্গ এড়াবার উদ্দেশ্যে গণেশদারড় পরের উক্তি : 'কোলেরটি আপনার ছেলে বুঝি? তা বেশ, তা বেশ।' কিশোরীর সলজ্জ আপত্তি : 'কী-যে বলেন আপনি গণেশদা, এ-তো পাশের বাড়ির বাচ্চা, আমার তো বিয়েই হয়নি।' সামাজিক জ্ঞানগম্যিহীন গণেশদা তখনও কিন্তু বলে যাচ্ছেন : 'তাতে কী, তাতে কী।'

এমনি মানুষ ছিলেন গণেশদা, শিশুর মতো সরল, সর্বপ্রকার কলুষতাহীন। যে-সমাজে স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলি অতিবাহিত করে গেলেন, তা পাজি থেকে পাজিতর হয়েছে, শঠ-মতলববাজ-ধুরন্ধরে ক্রমশ ছেয়ে গেছে। এদের মধ্যে বেশ-কিছু গণেশ ঘোষের ভালোমানুষির সুযোগ গ্রহণ করেছে। গণেশদার অভিধানে খারাপ কথাটি অনুপস্থিত ছিল। সবাইকে বিশ্বাস করতেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে যে-ই এসে তঁকে দুঃখের কল্পকাহিনী শোনাত, সঙ্গে-সঙ্গে করুণায় বিগলিত হয়ে যেতেন গণেশদা, অস্থির হয়ে উঠতেন গণেশদা : এই মহিলা বা যুবকের জন্য অবিলম্বে একটা-কিছু করতে হয়, অমুককে টেলিফোন, নয়তো তমুককে চিঠি। এমন হাজার-হাজার অপাত্র-অপাত্রীর জন্য গণেশদা শরীরপাত করেছেন, এঁকে-ওঁকে ধরেছেন, পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যার জন্য বলেছেন, সে তাঁর কৃপালাভের বিন্দুতম যোগ্য নয়। তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে অনেকে কাজ হাসিল করে নিয়েছে, তারপর আর তাদের টিকিটিও দেখা যায়নি।

ঠকেছেন, অপরের অসাধু আচরণের জন্য কখনও-কখনও বিব্রত-অপদস্থ হয়েছেন, কিন্তু কোনো কলুষতা তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করতে পারেনি। নির্মোহ মানুষ, অপরের জন্য সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষ— এমনধারা মানুষদেরই বোধহয় প্রাচীনকালে মহাপুরুষ বলা হতো। মহাপুরুষ দর্শনের অভ্যাস তো আমাদের চলে গেছে, তাই গণেশদাকে দেখে চট করে চিনতে পারতাম না আমরা।

মস্ত-মসৃণ-গাড়িতে-বসা চকোলেট-আইসক্রিম-চুষতে-থাকা ছেলেটি ও তার ফাঁপানো-চুল, কামানো-ভুরু, রঞ্জিত-ঠোঁট, জিনিশ-কিনে-কিনে-ক্লান্ত মার প্রতি সেই শবানুগমনের মুহূর্তে আমার ঠিক রাগ হচ্ছিল না, মনখারাপ হচ্ছিল মাত্র : এরা সমাজের যে-বিশেষ শ্রেণীভুক্ত, যুগের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো না, যুগান্তের সঙ্গেও না, তারা শুধু নিরেট কতগুলি দিন যাপন করে গেল, যাচ্ছে, যাবে, সেই দিনগুলিতে স্থূল সম্ভোগ আছে, থাকবে, কিন্তু জিয়ন্ত যন্ত্রণা নেই, তারা এত আকাট নিরক্ষর যে কোনোদিন গণেশ ঘোষের নাম পর্যন্ত শোনেনি, এবং তার জন্য তাদের লজ্জাবোধও হবে না কোনোদিন। তা ছাড়া, যে-আন্দোলনে পায়ে-বেড়ি-পরা গণেশদারা ঘানি টেনেছেন, সেখানে এখন পাঁচতারা হোটেল, বিমানে চেপে সদ্য-পরিণীত দম্পতির দল অহরহ মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাচ্ছে।

দেশপ্রেম ও সাম্যবাদের সমুজ্জ্বল সমন্বয়কারী

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে তরুণ প্রজন্ম 'জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করেছিলেন—গণেশ ঘোষ ছিলেন তাঁদের একজন।

গণেশ ঘোষের জন্ম ১৯০০ সালের ২২শে জুন অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার বিনোদপুর গ্রামে। বাবা বিপিন বিহারী ছিলেন রেলকর্মচারী, চট্টগ্রামে কর্মরত।

গণেশ ঘোষ স্কুলে পড়াকালীন মাস্টার'দা সূর্যসেনের সাথে পরিচিত হন এবং বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

কলকাতায় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সংগ্রামের সূচনার পর ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কিছুকাল সারা দেশ অসহযোগ আন্দোলনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধারা সেই আন্দোলন মেনে নেয়নি। গান্ধীজীর অনুরোধে তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী কর্মসূচী এক বছরের জন্য স্থগিত রাখতে রাজি হয়েছিলেন। চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী গণেশ ঘোষ ও তাঁর সহযোগী অনন্ত সিং-এর নেতৃত্বে স্কুল কলেজে ধর্মঘট হয়েছিল। অল্প বয়সেই এভাবে গণেশ ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে দেশের মুক্তি প্রয়াসে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর ১৯২২ সালে গণেশ ঘোষ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। গণেশ ঘোষ ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ১৯২৩-এ মানিকতলা বোমা মামলায় গণেশ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে বাংলাদেশব্যাপী বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু হলে—১৮১৮ সালের রেগুলেশন তিন ধারা অনুসারে গণেশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিনা বিচারে চার বছরেরও বেশী বিভিন্ন কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে মুক্তি লাভের পর গণেশ ঘোষ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর সংস্পর্শে আসেন। ঐ বছরই কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গণেশ ঘোষ প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদলের একজন নায়ক মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে গণেশ ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯২৯-৩০ সাল দেশজুড়ে নতুন করে গণ-আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল। তাতে ঝাপিয়ে পড়েন 'মাস্টার দা'—সূর্যসেনের মতো অকুতোভয় মানুষ। তাঁরই নেতৃত্বে বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে শুধু 'অহিংস' সত্যাগ্রহ নয়, ক্ষমতা দখল করে চট্টগ্রামে এক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার গঠনের দুঃসাহসী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল একদল তরুণ বিপ্লবীর (ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির-চট্টগ্রাম শাখা) ঝটিকা আক্রমণে চট্টগ্রামের সব গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দপ্তর ও অস্ত্রাগার দখল করে 'স্বাধীন সরকারের' ঘোষণা করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সামরিক শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলেও এই বিদ্রোহ ছিল প্রেরণাসঞ্চারকারী একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ' ছিল এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে গৌরবজনক ও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবীক কর্মকাণ্ড।

গণেশ ঘোষ ছিলেন এই যুব বিদ্রোহের অন্যতম পরিকল্পনাকারী এবং নায়ক। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সহ কয়েকজন বিপ্লবী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় পৌঁছালে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এঁদের তখনকার ফরাসী চন্দননগরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

১৯৩০-র ১লা সেপ্টেম্বর গভীর রাতে চন্দননগর গোন্দলপাড়ার গোপন ঘাটিতে কলকাতা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের বাহিনীর বিরুদ্ধে গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে এক ভয়ঙ্কর খন্ডযুদ্ধ হয়। মাখন ঘোষাল হত হন। গণেশ ঘোষ সহ বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন।

বিচারে গণেশ ঘোষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং ১৯৩২-এর আগস্টে আন্দামানে নির্বাসিত হন।

আন্দামানে থাকাকালিন সময়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ের (ডালহাউসী স্কোয়ারে বোমা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে ছিলেন) সংস্পর্শে আসেন ও সেদিনের আন্দামানবাসী বন্দীদের মধ্যে নতুন চিন্তার প্রভাবে গণেশ ঘোষ মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং কমিউনিস্ট কনসিলিডেশনের সদস্য হয়েছিলেন।

দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯৪১ সালে গণেশ ঘোষ সহ আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে গণেশ ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ঐ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকেই তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পরও অক্লান্ত বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে বারে বারে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর ১৯৫৩ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে, ১৯৫৪-এ শিক্ষক আন্দোলনে, ১৯৫৯-এ খাদ্য আন্দোলনে এবং ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় গণেশ ঘোষকে বিনা বিচারে জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল। মোট ২৭ বছর জেলে ছিলেন গণেশ ঘোষ। বহু বছর আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণেশ ঘোষ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও ডুয়ার্স অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত গরীব কৃষক, গোর্খা ও চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে একটা গোপন ঘাঁটি এবং একটা সশস্ত্র জঙ্গী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সেখানে যান।

দেশ ভাগের পর উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ববঙ্গের রংপুর, বওড়া, পাবনা, রাজসাহী এবং দিনাজপুর (পূর্ববঙ্গের) অংশ এই দশটা জেলাকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি একটা সমন্বয় কমিটি গঠন করে। উদ্যেশ্য ছিল কৃষকদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। গণেশ ঘোষ উক্ত সমন্বয় কমিটিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে গণেশ ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণেশ ঘোষ ঐ সময় বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলেন। নির্বাচনের কয়েকদিন মাত্র আগে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও নির্বাচনের পরই আবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল।

১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও গণেশ ঘোষ বেলগাছিয়া কেন্দ্র থেকেই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি. পি. আই (এম) প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণেশ ঘোষ ছিলেন একজন দক্ষ সাংসদবীদ্।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে গণেশ ঘোষ সি. পি. আই (এম)-এ যোগ দেন। ১৯৮৮ পর্যন্ত সি. পি. আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

গণেশ ঘোষ ছিলেন সুবক্তা ও সুলেখক। ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিপ্লব বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রথম সুদীর্ঘ সূর্যসেন স্মারক বক্তৃতা এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। তাঁর লেখা 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' বইটি আন্দামান সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী আর একটি দলিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণেশ ঘোষকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণেশ ঘোষকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান 'তাম্রপত্র'-মাসিক আর্থিক সাহায্য সহ বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার প্রস্তাব করলে গণেশ ঘোষ তা ঘৃণ্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এর দ্বারা তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও চরিত্রের বিশেষত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কোন প্রলভনেই গণেশ ঘোষ তাঁর আদর্শকে অবমানিত করেননি।

আত্মপ্রচার বিমুখ, অকৃতদার, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্থ, স্বভাব-বিনয়ী গণেশ ঘোষ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন সর্বজনপ্রিয় অজাতশত্রু। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন। সুগভীর দেশপ্রেম আর সাম্যবাদে অটল বিশ্বাসের মনোহর সমন্বয় গণেশ ঘোষের জীবন ও কর্মে সবাই প্রত্যক্ষ করেছি।

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা—স্বাধীনতা সংগ্রামী কিংবদন্তী নায়ক গণেশ ঘোষের জীবনাবসান হয় ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণেশ ঘোষের দান অপরিশোধনীয়। তাঁর ত্যাগ দেশবাসী সকৃতজ্ঞ চিত্তে চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গণেশ ঘোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

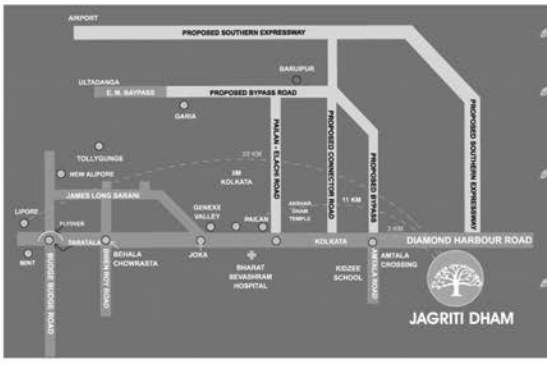

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503

contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 January 2019. Registered No. KOL RMS/455/2016-2018
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 1 Arek Rakam

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.